নব নায়িকা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
বিরচিত

প্রকাশক
শ্রীরাধারমণ দাস
ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস
৬০নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দাম ঃ দুই টাকা

ফাইন আর্ট প্রেস
৬০নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীরাধারমণ দাস কর্ত্তৃক
মুদ্রিত

শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

করকমলেষু

জীবন

তোমার চালে আমি—কি বল্‌বো? এ বইখানি তোমার হাতে দিচ্ছি—মনের কথা এই থেকেই বুঝতে পারবে, জানি!

শুভার্থী
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

৫২এ, বেণী নন্দন ষ্ট্রীট
কলিকাতা, বৈশাখ, ১৩৫০

নব নায়িকা

সনৎ সেনের কি-একখানা নূতন উপন্যাস ছাপিয়া বাহির হইলে চারিদিকে এমন হৈ-চৈ পড়িয়া গেল যে মোহনবাগান শীল্ড পাইতেও এমন কাণ্ড ঘটে নাই! ছোট ছোট সাপ্তাহিক এবং সদ্য-গজানো ক'খানা মাসিক কাগজে নিত্য সে-উপন্যাসের সমালোচনা বাহির হইতে লাগিল। সকলে লিখিল,—এত দিনে বাঙলা সাহিত্যে সত্যকার একখানি উপন্যাস দেখা দিয়াছে!

দু'চারিটা নূতন ফিল্ম-কোম্পানি সনৎ সেনের দ্বারে আসিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া রহিল,—বাঙলা-হিন্দী-পুস্তু—প্রভৃতি সব-ক'টা ভার্শন ছবি বাহির করিবে! ছবির জন্য দশ-পার্শেণ্ট কমিশনের লোভ দেখাইয়া তারা যে-কাণ্ড সুরু করিল…

ভরত নাট্যমঞ্চে আমি অভিনয় করি এবং সেখানকার নাট্য-প্রযোজকও এই আমিই! কোম্পানি আমাকে বলিল,—সনৎ সেনের কাছ থেকে প্লে-রাইটটুকু কিনে নিন্…বইখানা চারিদিকে যে-আগুন লাগিয়েছে, ও-আগুন নেববার আগে সারদা সান্যালকে দিয়ে ড্রামাটাইজ্ করিয়ে বোর্ডে চড়ালে একেবারে লঙ্কাকাণ্ড করে ফেলবো!

সনৎ সেনের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। থিয়েটার-লাইনে ঢুকিবার পূর্ব্বে যখন এ্যামেচারি করিয়া বেড়াইতাম, তখন রাজেনদার বৈঠকখানা ঘরে আলাপ-পরিচয়। সনৎ তখন বাঙলা সাপ্তাহিকে থিয়েটারের সমালোচনা লিখিয়া বেড়ায়। সাহিত্য সরোবরে তখন সে কোলা-ব্যাঙ্ হয় নাই···ক্ষুদ্র ব্যাঙাচি মাত্র!

সনৎ সেনের কাছে যাইবার পূর্ব্বে বইখানার সমালোচনা ভালো করিয়া পড়িয়া লইলাম। কোনো সমালোচনায় মিল নাই। কেহ লিখিয়াছে—এমন human touch আর-কোনো বাঙলা উপন্যাসে দেখা যায় না! কেহ লিখিয়াছে—চরিত্রগুলি একেবারে বাস্তব-জীবনের গা ফুঁড়িয়া বাহির হইয়াছে! কেহ লিখিয়াছে,—রিয়ালিষ্টিক যুগে এমন আইডিয়ালিষ্ট চরিত্র গড়িয়া তোলায় যে দারুণ অকুতোভয়তা, যে ভীষণ সাহস, নেপোলিয়নও তার কাছে হার মানে!

বইখানা আমি পড়ি নাই; যে-বই বাহির হইবামাত্র সমালোচক-দের মাথায়-মাথায় ডিগ্‌বাজী খাইয়া বেড়ায়, সে-বই পড়িতে ভয় করে! সোডা-ওয়াটারের বোতল খুলিবামাত্র টগ্‌বগানি ফোটে,—সে টগ্‌বগানি-ফোঁশ্‌ফোঁশানি থামিলে তবেই সোডা-ওয়াটার খাওয়া চলে! সমালোচনার টগ্‌বগানি কাটাইয়া যে-বই পরে বাঁচিয়া থাকে, আমি সেই বই পড়ি। এবং এ-বিধি মানিয়া কোনোদিন পস্তাই নাই!

সনৎ সেনের এ-উপন্যাস সম্বন্ধে কিন্তু সে-বিধি মানা চলিল না। মনিবের হুকুম,—ড্রামাটাইজ্ করাইতে হইবে, এবং সে কাজের জন্য মাস-মাহিনা দিয়া নাট্যকার সারদা সান্যালকে যখন থিয়েটারে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে এবং আমাকে দিতে হইবে সিচুয়েশনের আইডিয়া, তখন বইখানি পড়িতে হইল।

পড়ার পর একদিন সনৎ সেনের গৃহে গেলাম। সে থাকে হ্যারিশন রোডে ব্লু-বিল্ডিংসে তিন-তলার কামরায়।

দেখা হইল। সনতের কামরায় ছিলেন একজন তরুণী এবং দুজন তরুণ। তাঁদের সঙ্গে আলাপ হইল। তরুণীটি এযুগের পপুলার impressionairc শ্রীমতী মৃগাক্ষী দেবী, এবং তরুণ দুটি তাঁর বন্ধু ···ক্যালকাটা গে-লোফার্শ দলের পাণ্ডা। তাঁরা আসিয়াছেন সনৎ সেনের কাছে! তাকে দিয়া, ছোট একটি প্লে-লেট্ লিখাইয়া এম্পায়ারের বোর্ডে ষ্টেজ করাইবে—সেই উদ্দেশ্য লইয়া।

আমার পরিচয় পাইয়া মৃগাক্ষী দেবী শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—ঐ সব চরিত্রহীনা মেয়েদের সঙ্গে আপনারা কি বলে' অভিনয় করেন, তাই ভাবি!···অথচ শুনতে পাই, আপনি বেশ ভালো অভিনয় করেন!

সনৎ কহিল—গদাইয়ের প্লে আপনি দেখেন নি?

মৃগাক্ষী দেবী কহিলেন,—না। মানে, পাব্লিক ষ্টেজে যেতে পারি না তো! তার কারণ, ঐ বিশ্রী-এ্যাসোসিয়েশন···

ঘৃণায়-তাচ্ছিল্যে মৃগাক্ষী দেবীর মুখের যে ভাব দেখিলাম, শিহরিয়া রহিলাম···কোনো জবাব দিলাম না।

সনৎ কহিল—আপনারা যদি ব্যবসা-হিসাবে অভিনয় করতে নামেন, তাহলে আমাদের বাঙলা ষ্টেজ এই undesirable association থেকে মুক্তি পেতে পারে!

মৃগাক্ষী দেবী কহিলেন—আর্টকে আমি শ্রদ্ধা করি। সে আর্টকে অবলম্বন করে' পয়সার দাস্য? আর্টের তাতে অপমান হয় সনৎবাবু। অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়।···আপনিই বলুন, আপনি যদি পয়সার মুখ চেয়ে লিখতেন, তাহলে কি আর এমন সব গল্প-উপন্যাস লিখতে

পারতেন! তাহলে আপনি লিখতেন,—"পাঁচ খুন", "মিশিবাবা", "নগ্ন সত্য"—এই-রকম সব বই!

সনৎ কহিল,—এম্পায়ারে আপনারা প্লে করবেন বলচেন···সে-প্লেতে গদাইকে নামান্। এ-যুগে গদাইয়ের মতো character-player আর পাবেন না! This is my honest opinion.

মৃগাক্ষী দেবী কহিলেন—কিন্তু উনি যে পাব্লিক ষ্টেজের লোক! মানে···

মৃগাক্ষী দেবীর মুখে আবার সেই ভাব···চোখে ভ্রূকুটি-রেখা!

এ ইঙ্গিত সহিতে পারিলাম না, কহিলাম,—পাব্লিক ষ্টেজের অভিনেত্রীদের মধ্যেও এমন মেয়ে আছেন, বহু সোসাইটি-লেডির চেয়েও যাঁরা আর্টকে ভালোবাসেন। ষ্টেজ-সম্বন্ধে আপনার মনে যত বিশ্রী ধারণাই থাকুক, সেজন্য আমি কোনোদিন লজ্জা বা হীনতা বোধ করবো না!

তাঁরা চলিয়া গেলে সনৎকে জানাইলাম মনিবের অভিপ্রায় এবং আমার আগমনের উদ্দেশ্য।

সনৎ কহিল—কে ড্রামাটাইজ্ করবে?

আমি বলিলাম—সারদা সান্যাল।

সনৎ কহিল—মাপ করো ভাই! যেমন তাঁর মোটা দেহ, তেমনি মোটা রস-জ্ঞান।···তাঁর ড্রামাটাইজ-করা বই দেখতে তোমাদের থিয়েটারে বাদুড় ঝোলে, মানি। কিন্তু আমি চাই, নাটক দেখতে যাবে তারা, যারা সত্যিকারের মানুষ। বাদুড়-জাতের দর্শকের মন ভোলানোর নেশা তোমরা ত্যাগ করো—নাট্যলক্ষ্মী প্রাণ পেয়ে

বাঁচবেন'! তোমার সারদা সান্যালের নাটকগুলো যেন মিউনিসিপাল-মার্কেট! আলু-পটল থেকে মাছ-মাংস পর্য্যন্ত সব তাতে মেলে···মেলে না শুধু নাটক!

আমি বলিলাম,—কিন্তু জানো তো, অত-বড় সবজজ, ব্যারিষ্টার··· তাঁরাও থিয়েটার দেখে ওঁর লেখার কত সুখ্যাতি করেছেন!

সনৎ কহিল—জজ-ব্যারিষ্টারেরা আইন-কানুন সম্বন্ধে যা বলবেন, মানতে রাজী আছি,—তা বলে' নাটক সম্বন্ধে তাঁদের রায় মানতে হবে?···ধিক্! তা যদি শিরোধার্য্য করতে হয়, তাহলে তোমাদের সাহিত্য-সম্মিলনে এবার সভাপতি করো কাটলারির মালিক পঞ্চানন কম্মকারকে এবং নাটক লেখাও গিয়ে ঐ ওষুধওয়ালা বিশ্বম্ভর লাহাকে দিয়ে।···

এ সব আলোচনার পাশ কাটাইয়া প্লে-রাইটের ব্যবস্থা করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। কথা রহিল, সনৎ সেন নিজেই তার উপন্যাস ড্রামাটাইজ করিবে; এবং আমি তাকে বাৎলাইয়া দিব, কোথায় কি-রকম থিয়েটারী-প্যাঁচ দিতে হইবে!

সনতের উপন্যাসের প্লটে,—যাকে বলে, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত—প্রচুর আছে! নায়ক-নায়িকা পাঁচ-ছজন। বাছিয়া উহারি মধ্যে কাহাকে সবার বড় করিয়া তুলিব, নির্ণয় করা শক্ত। সব কটি চরিত্রই নিজেকে লইয়া মত্ত। সকলে ভালোবাসে এবং যাকে দেখে, তাকেই ভালোবাসে। সে-ভালোবাসায় প্রচণ্ড বেগ—এবং তার স্রোত সকল দিকে বহিয়া চলে। সে স্রোতে তলাইয়া যায় বীণা রায়! সে স্রোতে বুক ভাঙ্গিয়া যায় মেখলা দত্তর! সে স্রোতে ফণিনীর মতো শিবানী ফোঁশ করিয়া ওঠে! আবার বিধবা তরুণী কান্তি দেবী···সে ভালো-বাসায় বরফের মতো জমাট বাঁধিয়া যায়! ভালোবাসা কখনো হয়

আইডিয়ালিষ্টিক, কখনো রীতিমত sexual ! তবে সব কটি চরিত্র জীবন্ত ! ভাবিলাম, এমন জটিল কল্পনা, জটিলতর মনস্তত্ত্ব এবং জটিলতম চরিত্র—বাঙলা ষ্টেজের দর্শক এ-জিনিস পাইলে গুম্‌ হইয়া থাকিবে ! বই যত বুঝিতে পারিবে না, ততই সে-বই দেখিতে ভিড় জমাইবে।

নাটকে ছিল গণিকা ডালিমের চরিত্র। ডালিম যা করে, সব অদ্ভুত! কখনো বনিয়া ওঠে প্রচণ্ড সতী! আবার কখনো দেখি, সে চাকরদের সঙ্গে ডুয়েট-গান গায়···রীতিমত vulgar !

কথায়-কথায় সনৎকে বলিলাম—এই যে গণিকা ডালিমের চরিত্র এঁকেছো, সত্যকার গণিকা সম্বন্ধে কোনো কথা তুমি জানো ? মানে, আসলে তারা কি চীজ্‌ ?

মৃদু হাস্যে সনৎ বলিল—না। তবে ওদের সম্বন্ধে আমার মনে যা হয়···

কহিলাম—আচ্ছা, এবারে যখন নাটকের পথে পা দিলে, তখন একবার জীবন্ত লোকের পরিচয় একটু নাও। তাহলে কি হবে জানো, তোমার এ আইডিয়ালিষ্টিকের সঙ্গে রিয়ালিষ্টিকের একটা যোগ থাকবে, তাতে নাটক আরো বেশী জোরালো হবে !

সনৎ কহিল—তাহলে তোমার বিশ্বাস, এ বই থিয়েটারে জমবে না ?

কহিলাম—তা নয়। হয়তো ভয়ঙ্কর জমবে। মানে, আমাদের দেশের অডিয়েন্স জানে, এ-সব স্ত্রীলোক মানুষকে শুধু শোষে,—শোষণ ছাড়া এরা আর কিছু জানে না ! হাবে-ভাবে ভালোবাসার অভিনয় করে ! সে ভালোবাসা শুধু অভিনয় ! শোষণের মন্ত্র ! তারা তোমার নাটকে দেখবে, তোমার এই গণিকা ডালিম···ভালোবাসার কথা কেউ বলতে গেলে তাকে সে ধমক দেয় ! অথচ ডালিমের বাড়ীতে গিয়ে

মুঠোমুঠো টাকাও সকলে দিয়ে আসছে! মানে কি জানো, দর্শকের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই···যা নয়, যা হতে পারেনা, যদি তাই হতে দেখে ষ্টেজের নাটকে···তাহলে ভয়ঙ্কর মেতে ওঠে।···

ষ্টেজে সনতের সে-নাটক খুব জমিয়া উঠিল। অভিনয় আরম্ভ হইবার দু'ঘণ্টা আগে টিকিট-ঘরের সামনে House Full লেখা বোর্ড লটকাইয়া দেওয়া হয়। ন'আনার টিকিট থিয়েটারের সামনে আঠারো আনায়, আঠারো আনার টিকিট দেড় টাকায় বিক্রয় হয়। তবু ভিড় কমিতে চায় না!

মাসখানেক পরে সনৎকে বলিলাম—আর একখানা নাটক লেখো ···উপন্যাস ভেঙ্গে নাটক নয়, একদম নাটক লেখো।···খ্যাতির সঙ্গে নাটকে পয়সা মেলে অনেক বেশী।

হাসিয়া সনৎ কহিল—সে কথা সত্যি। তবে···তুমি যে সেই বলেছিলে···

আমি কহিলাম,—ও, মনে পড়েছে। পতিতার সতীত্ব···এই theme নিয়ে লেখো। স্ত্রীর নিষ্ঠা নিয়ে এত নাটক দেখছি···ও-ব্যাপার মামুলি হয়ে গেছে। এখন···মানে···

সনৎ কহিল—Life থেকে সে চরিত্র আঁকবো? তুমি ব্যবস্থা করবে বলেছিলে···

কহিলাম—সে-ব্যবস্থা অচিরে করছি!

সনৎ কহিল—যে-নাটক লিখবো কল্পনা করেছি, তার হিরোইন

হবে একজন পতিতা নারী…রূপসী, বয়সে তরুণ…অসাধারণ বুদ্ধিশালিনী…একটুতে তার মেজাজ যেমন চটে, তেমনি আবার একটুতেই সে খুশী হয়। অর্থাৎ আশ্চর্য্য রকম হবে তার চরিত্র, magnanimous…নাচে-গানে অসাধারণ পটুতা…গলা যেমন মিষ্টি তার দেহের ভঙ্গিতে তেমনি নাচের ছন্দ ঝরে পড়ে! মনে কপটতা নেই, হিংসা নেই, অহঙ্কার নেই, লোভ নেই…উদার, দরদে মন ভরে আছে, ভালোবাসার জন্য সমস্ত পৃথিবীকে ত্যাগ করতে পারে! খুব পড়াশুনা করেছে…কন্‌টিনেণ্টাল সাহিত্যের আলোচনায় তার সঙ্গে পারা দায়!

চুপ করিয়া সনতের কথা শুনিলাম। পরে কহিলাম,—তোমার সঙ্গে নর্ম্মদার পরিচয় করিয়ে দেবো। খুব accomplished মেয়ে। বোম্বাই ঘুরে এসেছে…এ্যারিষ্টোক্র্যাট-সমাজে তার খুব খাতির। যেমন গান গায়, তেমনি নাচে! আনা পাবলোভা ওর সঙ্গে দেখা করে এদেশী নাচের দু' একটা ভঙ্গি শিখে নিয়েছিলেন। তার নাম শুনেচো নিশ্চয়…নর্ম্মদা দেবী?

সনৎ কহিল—দেবী!

আমি কহিলাম—হ্যাঁ। ফিল্ম কোম্পানিতে ঢোকা-ইস্তক এঁরা সব দেবী হয়েছেন! 'দেবী'তে এঁদের দাবী হয় ফিল্মে নামার সঙ্গে। আমাদের এই ষ্টেজের শ্রীমতীরাই শুধু দাসী রয়ে গেল—দেবী হতে পারলো না! ষ্টেজে না কি এ্যাসোশিয়েসনটা লো—তাই। তা ও-কথা যাক্,—এই নর্ম্মদার পেট্রন ছিল তখন এক মস্ত ধনী…সিল্ক-মার্চ্চেণ্ট ফিরোজ শা।

সনৎ কহিল—তোমার সঙ্গে পরিচয় আছে?

কহিলাম,—আছে। আমাকে একটু খাতির করে। বাঙলা ষ্টেজে

যাহোক একটু নাম করেছি তো···ইংরেজের কাগজে একবার আমার ছবি বেরিয়েছিল, তার ফলে পাংক্তেয় হতে বাধা ঘটে নি। নর্ম্মদা এখানে আছে। ভাবছিলুম, থিয়েটারে নামাবো···বরাবরের জন্য না হয়, অন্ততঃ মাসখানেক কি দু' মাস···তাতে পাব্লিশিটি পাবে···তারো ইচ্ছা হয়েছে। সেই সূত্রে আমার খাতির এখন একটু বেড়েছে।

সনৎ কহিল—ও!

কহিলাম—জানো বোধ হয় নর্ম্মদার জন্ম ভদ্র ঘরে···এবং বেশ সম্ভ্রান্ত বংশে?

সনৎ কহিল—বটে!

আমি কহিলাম—তাই। ওর হৃদয়ের আবেগ বড় বেশী, তার উপর নাচে-গানে প্রতিভার বিকাশ-সাধনে ওর আগ্রহের সীমা ছিল না। কাজেই বেচারা-স্বামীটিকে আশ্রয় করে ছোট্ট সংসারে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারলো না! তাই সে বেছে নিল বিশ্ব-নিখিল দু'কাঠার পরিবর্ত্তে!···

সনৎ কহিল—বুঝেচি, গ্রামোফোনে যে নর্ম্মদা দেবীর রেকর্ড আছে···তাঁর কথা বলচো?

কহিলাম—সেই নর্ম্মদা!···বেঙ্গলি-মেলবা-নামে তার পরিচয় রেকর্ডের বিজ্ঞাপনী-সাহিত্যে দেখেছো, নিশ্চয়!

বেঙ্গলি-মেলবার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিলাম। একদিন সন্ধ্যায় ব্রাইট-ভিউ রেস্তঁরার বারান্দায় চায়ের আসর। সেই আসরে টেবিল ঘিরিয়া আমরা তিনজন···নর্ম্মদা, সনৎ এবং আমি।

সনতের পরিচয় দিলাম।

নর্ম্মদার দুই চোখে বিস্ময়ের বিদ্যুদ্দীপ্তি! উচ্ছ্বসিত স্বরে নর্ম্মদা কহিল,—আপনি বই লেখেন!…উপন্যাস! নাটক! বাঃ!…দেখুন, এই বাইশ বৎসর বয়সে অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হলো, কিন্তু কোনো লেখককে আজ পর্য্যন্ত সজীব দেহে পাশে দেখিনি!… Luck!

সনৎ কথা কহিল। সাহিত্যের কথা, আর্টের কথা! কিন্তু নর্ম্মদা সে-সব কথার ধার ধারে না। জগতে সে জানে একটি বিষয় —নিজের স্তুতি-বাদ!…

সনৎ যত কথা বলে, উত্তরে ঘুরিয়া-ফিরিয়া নর্ম্মদা সেই একই কথার কূলে নিজের উচ্ছ্বাসের তরী আনিয়া ভিড়ায়!

সনৎ মুগ্ধ চিত্তে তার কথা শুনিতে লাগিল। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল…সে আলোর পাশে বিজলী-বাতির আলো…মনে হইতেছিল, যেন পরিহাস!

উচ্ছ্বসিত স্বরে নর্ম্মদা কহিল—চাঁদ উঠেছে! বাঃ!…আচ্ছা সনৎবাবু, আপনারা কবি, বলুন তো, লেখায় চাঁদকে নিয়ে যতখানি বাড়াবাড়ি করেন, মনে-মনে চাঁদকে ঠিক ততখানি শ্রদ্ধা করেন… সত্যি?

মৃদু হাস্যে সনৎ কহিল—চাঁদের আলোয় মনে অনেকখানি অদল-বদল হয় বৈ কি!

নর্ম্মদা কহিল—আমার হয়, তা স্বীকার করবো! যখন বিজলী থিয়েটারে 'শকুন্তলা' প্লে হয়, আমি সেজেছিলুম 'শকুন্তলা'। তার একটা শীনে…মানে, যে-শীনে রাজার বিরহে শকুন্তলা কাতর…আমি বলেছিলুম, সে-শীনে আমার চাঁদ চাই…চাঁদের আলোর effect না পেলে প্লে্তে তন্ময়তা আনতে পারবো না।

নর্ম্মদা আবার নিজের কাহিনী সুরু করিল···কবে কোন্ নাট্য-কারকে দিয়া তার ভূমিকার লেখা ডায়ালগ আগাগোড়া কাটিয়া নূতন করিয়া লিখাইয়াছিল! বিপক্ষদের ভাড়া-করা এক সমালোচক নর্ম্মদার একটা অভিনয়ের মিথ্যা নিন্দা কাগজে ছাপাইয়াছিল বলিয়া নর্ম্মদা তাকে থিয়েটারের গ্রীণরুমে ডাকাইয়া আনিয়া তার গালে চড় বসাইয়া সে-স্পর্দ্ধার সাজা দিয়াছিল! কবে কোন্ ভদ্রলোক প্রণয়-নিবেদনের সঙ্গে চিঠির মধ্যে তাকে হীরার ব্রুচ পাঠাইয়াছিল, ঘৃণা-ভরে সে-চিঠি ও ব্রুচ নর্ম্মদা ফেরত পাঠাইয়াছিল···নাট্য-জীবনের নানা অঙ্কের টুকিটাকি কাহিনী বলিতেছিল!

মন দিয়া আমি তার কথা শুনিতেছিলাম। তার এই টুকিটাকি কাহিনী শুনিলে বুঝা যায়, সেরা অভিনেত্রী হইলেও আসলে সে নারী!

সে রাত্রে নর্ম্মদা বিদায় লইলে আমরা গৃহে ফিরিলাম। পথে সনৎকে বলিলাম—কি হে, আলাপ করে কিছু পেলে? মানে, নতুন নাটকে জীবন্ত চরিত্র-সৃষ্টির উপাদান?

সনৎ কহিল—চমৎকার! ঠিক এমনি একটি চরিত্র আমি এঁকেচি আমার নাটকে! নর্ম্মদা দেবী ভাববেন, বুঝি, তাঁর কথা লিখেছি,—কিন্তু এঁর সঙ্গে আলাপ হবার অনেক আগে আমি এ-চরিত্র লিখেছি।

সবিস্ময়ে আমি সনতের পানে চাহিয়া রহিলাম।

সনৎ কহিল—আর্টের স্বপ্নে বিভোর! পয়সা-কড়ির বিষয়ে নির্লিপ্ততা! আমার নায়িকার মনও ঠিক এমনি উঁচু পর্দ্দায় বাধা!

দুনিয়ায় যারা ছোট্ট-স্বার্থ-বিলাসী vulgar, তারা এসে পদে-পদে বাধা তুলে দাঁড়ায়, আমার নায়িকা দু'পায়ে তাদের মাড়িয়ে চলে যাচ্ছে…রাজেন্দ্রাণীর মতো! তা হলেই দেখচো, আমাদের কল্পনার সঙ্গে বাস্তব কি আশ্চর্য্যভাবে মিলে যায়!

তার উচ্ছ্বাসে বাধা দিলাম না। মানুষকে আমরা যে-চোখে দেখি, কবি সনৎ সে-চোখে দেখে না! কাজেই আমরা যেখানে দেখি, তুচ্ছ মানুষ—ওরা সেখানে দেখে, দেবী, নয় হয়, অপ্সরী!

তিন মাস পরে সনতের লেখা নূতন নাটকের অভিনয় হইল। সনৎ আমাকে বলিয়াছিল—নর্ম্মদা দেবীকে নিমন্ত্রণ করে কার্ড পাঠিয়ো।

কার্ড পাঠাইয়াছিলাম। বেয়ারা আসিয়া খবর দিল, নর্ম্মদা দেবী এখানে নাই, লক্ষ্ণৌ গিয়াছেন।

আরো দু'মাস পরে কলিকাতা সহরের আষ্টে-পৃষ্ঠে রঙীন প্লাকার্ড পড়িল!

ভারতের বহু সুধী-তীর্থে বিজয়াভিযান-সমাপনান্তে কলিকাতার এম্পায়ার থিয়েটারে বিজয়িনী নৃত্য-রঙ্গিণী নর্ম্মদা দেবীর প্রাচ্য নৃত্য!

সেই সঙ্গে ভারতের নৃত্য-ললনাদের বিচিত্র নৃত্য-লীলা!

এম্পায়ারে তারিখ দেখুন।

সনতের নাটক তখনো ষ্টেজে পুরা দমে রাজত্ব করিতেছে।

সনৎ কহিল—নৰ্ম্মদা দেবী আসচেন···পথে-ঘাটে প্লাকার্ড দেখলুম।

আমি কহিলাম—হ্যাঁ! আমিও দেখেছি।

সনৎ কহিল—তিনি এলে তাঁকে একখানা কার্ড পাঠিয়ো··· থিয়েটারে আমার এ-বইখানা দেখবার জন্য।

জবাব দিলাম—পাঠাবো···

•

আট-দশ দিন পরের কথা। সন্ধ্যার আগে থিয়েটারে বসিয়া আছি, টেলিফোনে আমার ডাক পড়িল। রিশিভার ধরিয়া কহিলাম—হ্যালো···

জবাবে শুনিলাম,—গদাইবাবু?

কহিলাম—হ্যাঁ।···আপনি?

—নৰ্ম্মদা। গ্রীন্ বারে আছি···তেতলায়। রুম নাম্বার সিক্স। কাল একবার আসুন না···সকালের দিকে···কেমন?

কহিলাম—যাবো।

•

গেলাম। গিয়া দেখি, নৰ্ম্মদার নূতন বেশ। পরণে আশমানি-রঙের সাটিনের ঢিলা-পায়জামা, গায়ে সিল্কের চুড়িদার ঢিলা পাঞ্জাবি, গলায় মুক্তার মালা, হাতে হীরার ব্রেশলেট, পায়ে সোনালি-চামড়ার চটি।

নৰ্ম্মদা ভারত-বিজয়ের বহু কাহিনী বলিল। ওদিকে দিল্লী, লাহোর, আম্বালা, গোয়ালিয়র, জয়পুর; সেদিকে পুনা, বোম্বাই, গুজরাট···যেখানে গিয়া নাচিয়াছে, থিয়েটার-বাড়ী লোকে একেবারে

লোকারণ্য হইয়াছে। বাঙলা-হিন্দী-উর্দ্দু গান গাহিয়াছে! বাঙলা-গানকে ওদিকে সে ভয়ঙ্কার পপুলার করিয়া আসিয়াছে!

নর্ম্মদা ডাকিল—রহিমা…

পাশের ঘর হইতে এক মুসলমান দাসী আসিল। হিন্দী ভাষায় নর্ম্মদা তাকে প্রশ্ন করিল—গোয়ালিয়রের সেই লোকটির নাম কি রে?

রহিমা কহিল—কে?

নর্ম্মদা কহিল,—আঃ, সেই যে…মাথায় হীরে আর মুক্তার মালা-জড়ানো মস্ত ইয়া পাগড়ি…কানে হীরের কাণবালা…সেই যে রে, আমায় যে বিয়ে করতে চেয়েছিল! আহা, নামটা মনে পড়চে না…

রহিমা কহিল—ও, সেই অর্চ্চনা সিং?

নর্ম্মদা কহিল—হাঁ, হাঁ, অর্জ্জন সিং। বুড়ো। বয়স হয়েছে। আমার নাচ দেখে মশগুল! গান শুনে পাগল!…ষ্টেজে আমাকে উপহার দিলে একছড়া জড়োয়া নেকলেশ। তারপর দেখা করতে এলো। প্রকাণ্ড উলসলী-গাড়ী ছেড়ে দিলে আমাকে ব্যবহার করতে। শেষে বুড়ো বলে, বিয়ে করবে! আমি বললুম—পাগল!…কত মিনতি, অনুরোধ! শেষে পায়ে ধরে সাধাসাধি! লজ্জায় আমি মরে যাই! যখন রাজী হলুম না, তখন বলে কি না, দাও আমার নেকলেশ ফিরিয়ে… ও-ছড়া আমার দিদিমার গলার নেকলেশ…বহুৎ দাম!

রহিমা বলিল—দিলেই পারতে, কখনো তো সে নেকলেশ তুমি পরলে না!

—ফিরিয়ে দেবো! বলিস কি রহিমা? কেন?…তাকে ঘরে বসিয়ে তার সঙ্গে কথা কয়েছি…তার বুঝি দাম নেই?… হুঁঃ!… (পরে আমার পানে ফিরিয়া) শুনুন তো রহিমার কথা!

আমি হাসিলাম। কহিলাম,—কিন্তু…এ তো paying homage to Art…অর্ঘ্য! পূজার পুষ্প-অর্ঘ্য। দেবতাকে আমরা পূজা করি দেবতার পায়ে ফুল দিয়ে·· সে ফুল ফিরিয়ে নিয়ে সসম্মানে তুলে রাখি! বেচারা অর্চ্চনা সিং সে নেকলেশ ফিরে চেয়েছিল হয়তো সেটিকে শিরোধার্য্য করে রাখবে বলে! কিন্তু ভুল করেছিল অর্চ্চনা সিং… এক্ষেত্রে দেবতা জীবন্ত! পাথরের ঠাকুর নয় তো যে দামী অর্ঘ্য ফিরিয়ে দেবে!

কথাটা বলিয়া আমি হাসিতে লাগিলাম।

নর্ম্মদা কহিল—জানেন, আমি সে-নেকলেশের দর যাচাই করিয়েছিলুম। পনেরো হাজার টাকা দাম!

দু'চার কথার পর বলিলাম—তোমার নাচের তারিখ এখনো announce করোনি যে?

নর্ম্মদা কহিল,—দু'তিনজন এখনো এসে পৌছোয় নি। মাদ্রাজ থেকে আসচে পদ্মা, গুজরাট থেকে লছমী বাঈ, আর ট্রাভাঙ্কোর থেকে আসচে চন্দ্রা। তারা এলেই তারিখ announce হবে। দু'-তিনদিনের মধ্যে তারা এসে পৌছুবে। টেলিগ্রাম পেয়েছি।

আমি বলিলাম—ভালো কথা, আমাদের থিয়েটারে চলো একদিন …সেই যে তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সনৎ সেন…তাঁর নতুন নাটক প্লে হচ্ছে। ভয়ঙ্কর successful play! এত ভিড় হচ্ছে এখনো, যে দেখে তাক লেগে যাবে!

নর্ম্মদা ভ্রূ-কুঞ্চিত করিল। কহিল—কে সনৎ সেন?

—সেই যে চৌরঙ্গীর প্রাইভেট গ্রিলে দেখা…তোমার পুরোনো ঠিকানায় একখানা বইও সে পাঠিয়েছিল।

—ও…হ্যাঁ, হ্যাঁ…পোষ্ট-অফিস থেকে redirect হয়ে সে-বই

আমার কাছে গিয়েছিল বটে! ঠিক! ঠিক!···তা তোমার বন্ধু হলে কি হবে, তার স্পর্দ্ধা দেখে আমি অবাক হয়েছি! আমাকে করেছে সে তার নাটকের **heroine**!

—তার মানে?···

—তা নয় তো কি? Heroine একজন dancer-woman···ও তো আমি!···এমন অভদ্র জানলে তার সঙ্গে আলাপ করতুম না।

আমি কহিলাম—কিন্তু তোমার সঙ্গে আলাপ হবার আগেই সে ও-বই লিখেছে।

—আমার দু'চারজন বন্ধু কিন্তু সে-বই পড়ে বলেছে···ও heroineটি আমি!

কহিলাম—তুমি নিজে সে বই পড়েচো?

—আগে পড়িনি। কত লোক বই পাঠায়, চিঠি পাঠায়, কত কি পাঠায়। সে সব দেখতে গেলে মানুষ বাঁচতে পারে না!···বন্ধুরা যখন বললে, heroine আমিই, তখন একবার বইখানা দেখেছি।

কহিলাম—কিন্তু বইয়ের heroine-এর বয়স বাইশ বছর মাত্র!

নর্ম্মদা কহিল—আমার বয়স আসলে যতই হোক, বাইশ বললে কেউ সন্দেহ করবে না। বয়সকে আমরা কত যত্নে আটকে রাখি··· তা জানো?

—কিন্তু নাচে-গানে নায়িকার প্রতিভা কতখানি! তা ছাড়া heroineএর মন পয়সা-কড়ির সম্বন্ধে নির্লোভ! এবং বেচারী একেবারে ভালোবাসার কাঙাল!

একটা রুক্ষ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া নর্ম্মদা বলিল—আমার সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা?

অসঙ্কোচে কহিলাম—তুমি?···পাষাণ-প্রতিমা!

নর্ম্মদা নিমেষে যেন কাঠ !···আমি তার পানে চাহিয়া রহিলাম।

একটু পরে নর্ম্মদা বলিল—নাটকে ঐ হীরের আংটির ঘটনা···ও গল্প সেদিন আমি বলেছিলুম! নয়? সেই জোয়ানপুরের কুমার বাহাদুর আমার প্রেমে বিভোর হয়ে নিত্য নূতন উপহার দিত···একদিন আর-একটি ভদ্রলোক এসেছিলেন···নিরীহ ভদ্রলোক···আমার গান শুনতে! তাতে কুমার বাহাদুর রেগে আগুন হলেন···এবং কি ভয়ঙ্কর ঝগড়া! শেষে রেগে আমি তার দেওয়া হীরের আংটি দিলুম ছুঁড়ে ফেলে! ভালোবাসার বচনে অজস্র দাতা হলেও কুমার বাহাদুর এদিকে তো কৃপণ! গেল তাঁর সঙ্গে প্রণয় ছুটে সে-ব্যাপারের পর।

গভীর মনোযোগে গল্প শুনিতেছিলাম···

নর্ম্মদা কহিল—সে-ব্যাপারের পর মন কখনো কারো উপর প্রসন্ন থাকে, বলো?···এ গল্প সেদিন বলেছিলুম কথায়-কথায়···আর তোমার ঐ সাত্যনবাবু না ভরৎবাবু···নাট্যকার কি না, সে-গল্পটি বেমালুম চুরি করে' তাঁর নাটকে গুঁজে দেছেন!···একে বলে বিশ্বাস-ঘাতকতা! এর জন্য তোমরা দুজনেই অপরাধী!

আমি কহিলাম—কিন্তু এ-গল্পটি আমি কোন্ মাসিক পত্রে পড়েছিলুম! তা ছাড়া এ গল্পটি নিজের জীবনের বর্ণনা বলে চালিয়ে দিতে শুনেছি গ্রামোফোন্-গায়িকা মনতারাকে! আমাদের থিয়েটারের গজেন্দ্রগামিনীও এ গল্পটি নিজের বলে' চালিয়েছিল! এ তো একটা মামুলি কাহিনী! আর অমৃত বোসের তরুবালাতেও এমনি একটা কাহিনী যেন আছে বলে মনে পড়ছে!

নর্ম্মদা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইল না, অসঙ্কোচে কহিল—আর-পাঁচজনের জীবনে এমন ব্যাপার ঘটেছিল বলে' আমার জীবনে ঘটবে না বা ঘটেনি, এ-কথার মানে আমি বুঝতে পারি না। বলো, যদি তো সে-আংটি

এনে আমি তোমায় দেখাতে পারি! ড্রেন থেকে তুলিয়ে সে-হীরেটাকে আমি reset করিয়ে রেখেছি!

আমি হাসিলাম। হাসিয়া কহিলাম—গজেন্দ্রগামিনী বলেছিল, তার আংটি ছিল পান্নার, হীরের নয়। আর মনতারা বলেছিল, তার আংটিতে ছিল মস্ত একখানা মুক্তো, না, চুণী!

—তাহলে রায় বাহাদুরের কথাও সেদিন নিশ্চয় বলেছিলুম? রায় বাহাদুর হরেন দাস···রিটায়ার্ড এ্যাডিশনাল জজ?

হরেন দাস নামটা মনে পড়িল। রিটায়ারের পরে হরেন দাস এককালে নম্মদার বাড়ীতে পড়িয়া থাকিতেন বটে! হরেন দাস নম্মদাকে একখানা বাগান কিনিয়া দিয়াছিলেন সিঁথির ওদিকে।

নম্মদা বলিল—আমাকে সঙ্গে নিয়ে রায় বাহাদুর গিয়েছিল হ্যামিলটনের দোকানে। সেখান থেকে কিনে দেয় আমার পছন্দমতো একছড়া মুক্তোর কলার। আমি তখন ষ্টার থিয়েটারে প্লে করি· তোমরা বোধ হয় তখন কলেজে পড়চো···থিয়েটারে ঢোকোনি! সে কি আজকের কথা? রায় বাহাদুর লোকটা ভারী কঞ্জুস ছিল! তাকে দেখেচো?

—না, নাম শুনেছি। বুড়ো বয়সে বৌ মারা যাবার পর মেজাজ না কি কাপ্তেন হয়ে ওঠে!

নম্মদা কহিল—জজীয়তী করলেও তার মেজাজ ছিল ভারী ঠাণ্ডা! তবে দারুণ সন্দিগ্ধ মন! সেবারে সেই সুন্দরবন ট্রিপে বেরুলুম·· জাহাজে ছিল সুপুরুষ একটি বাঙালী ভদ্রলোক। বয়স অল্প। চমৎকার গান গাইতে পারে! তাকে আমার ভারী ভালো লাগলো! আলাপ করবার ক্ষমতা ভদ্রলোকের ভারী চমৎকার! তা ছাড়া আমাদের সঙ্গে এসে যেচে স্বেধে আলাপ করতো! সেই জাহাজে ছিল একজন সাহেব

আর তার মেম। তারা তো আমাকে নিয়ে পাগল ! বলতো, নিমু… সুইট্ নিমু…কিন্তু সে কথা যাক্, একদিন সেই বাঙালী ছেলেটির সঙ্গে বেড়াতে গেলুম। বিকেলের দিকে জাহাজ নোঙর করেছিল আমাদের কথায়। জাহাজে ফিরে এলুম, রাত তখন আটটা। জ্যোৎস্না ফিনিক ফুটছে !…ফিরে এসে দেখি, বুড়ো রায় বাহাদুর গুম্ হয়ে বসে আছে …যেন একটা কাঠের কুঁদো ! আমায় বললে—যার-তার সঙ্গে যেখানে-সেখানে তুমি যাও কি বলে, শুনি ? আমি বললুম—যার-তার সঙ্গে যাবো, এমন দুর্বুদ্ধি আমার কেন হবে ?…গিয়েছিলুম এই শুকদেব বাবুর সঙ্গে !…বন্ধু লোক !…সবজজ বললে—বন্ধুর সঙ্গে যাবে যদি তো আমার ঐ মুক্তোর মালা গলায় দিয়ে বাহার দাও কোন্ লজ্জায় ! কথার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো আমায় দিলে ধাক্কা ! সে-অপমান আমি সইলুম না ! তার চোখের সামনে গলার সে-কলার ছিঁড়ে তখনি জলে ফেলে দিলুম ! হৈ-হৈ রব তুলে বুড়ো একেবারে অজ্ঞান ! বললে—এত দামের গয়না ! আমি বললুম—তুমি ভালোবেসে দিয়েছিলে বলেই তোমার ভালোবাসার দামে আমি ওর দাম করেছিলুম। তাছাড়া আমার কাছে ওর অন্য দাম ছিল না !

সাশ্চর্য্যে আমি কহিলাম,—বলো কি ! এত বড় নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ করেছিলে …তুমি বুদ্ধিমতী ভাগ্যবতী শ্রীমতী নর্ম্মদা দেবী !

নর্ম্মদা সে-কথা কাণে না তুলিয়া বলিতে লাগিল—সেদিন সারা রাত, তার পরের দিন সারা দিন-রাত…রায় বাহাদুরের সঙ্গে একটি কথা কইলুম না ! তার ধার মাড়ালুম না !…শেষে রায় বাহাদুর আমার পায়ে ধরে মাপ চায়।…আর কলকাতায় ফিরে রায় বাহাদুর আমাকে নিয়ে আবার হ্যামিলটনের দোকানে গিয়ে ঠিক তেমনি আর একছড়া মুক্তোর কলার দেয় কিনে ! জানো ?

কথার শেষে নর্ম্মদা হাসিতে লাগিল। হাসিয়া কহিল—আমাকে বলো, নির্ব্বোধ!·· ভাবো, যে-কলার জলে দিয়েছিলুম, সেটা রায় বাহাদুরের কেনা সেই প্রথম কলার?···তা নয়। বাইরে যাচ্ছি···যাবার আগে সে-কলার বাড়ীতে রেখে গিয়েছিলুম। যেটা জলে দিয়েছিলুম, সেটা ছিল ঝুটো মুক্তোর কলার। থিয়েটারে সাজবার সময় গলায় দি। হুঁঃ! পুরুষ-মানুষরা আবার বুদ্ধির বড়াই করে! আমাদের একটু হাসি, একটি চাহনির নেশায় তারা না করতে পারে কি, তা জানি না!

কথায় কথায় সনৎ সেনের নাটক চাপা পড়িল।

আমি কহিলাম—তাহলে থিয়েটারে আসছো একদিন?

নর্ম্মদা কহিল—ক্ষেপিনি তো! যা-তা লেখা···পাগলের মতো মুখস্থ করে বকতে হয় বলেই বাঙলা থিয়েটারে আমার অরুচি ধরে গেছে! পচা মামুলি কথা নিয়ে কারবার! তাই আমি ও-লাইন ছেড়ে নাচ-গান নিয়ে আছি। খাশা আছি! মান···ইজ্জৎ···পয়সা ···সেই সঙ্গে স্বাধীনতা···অবসর! তোমার থিয়েটারে নয়, তুমি এসো বরং এম্পায়ারে···ক'দিনই এসো, আমাদের নাচ দেখতে, গান শুনতে···aristocratic atomsphere! পারো যদি তোমাদের সেই নাট্যকারটিকেও সঙ্গে নিয়ে এসো। আর কিছু লাভ তার না হোক, বাঙলা নাটক লিখে যে কোনো আনন্দ পাওয়া যায় না, এটুকু অন্ততঃ সে বুঝবে!···কি জানো? আমার এই বিশ বৎসর বয়সে কতই তো দেখলুম···

কহিলাম,—তোমার বয়স বিশ বৎসর?···বলো কি নর্ম্মদা!

হাসিয়া নর্ম্মদা কহিল,—সন্দেহ করো না। আমি হলুম উর্ব্বশী·· তাই চিরদিন আমার বয়স রয়ে গেল বিশ থেকে পঁচিশের মধ্যে। It is an art···বুঝলে, এই এক-বয়সে থেকে যাওয়া···

এম্পায়ারে গিয়াছিলাম। নর্ম্মদা দেবীর ভারত-জয়ী নাচ দেখিতে, গান শুনিতে।

কণ্ঠ সত্যই অপরূপ! আর নাচ? দেহের প্রতি ভঙ্গিমায় ছন্দের বিচিত্র লীলা!

তার সব দোষ, সব দুর্ব্বলতা ভুলিয়া গেলাম। পুরুষকে তুচ্ছ করিয়া, কুহক-চাতুরীতে যত শয়তানী করিয়া বেড়াক...নাচে-গানে এ-নর্ম্মদাকে মিথ্যাচারিণী নর্ম্মদা বলিয়া মনে হয় না!

সত্যকার অভিনেত্রী! পতিতার সঙ্গে এইখানেই গৃহ-সংসার-বাসিনীর প্রভেদ!...এর পাশে সনতের কল্পনায়-আঁকা পতিতা-নারী যেন কাঠের পুতুল! সাধে বলি, নারীর যদি পতন হয় তো সে পতিতা নারী এই নর্ম্মদার মতো হোক!...সনৎ সেনের লেখা পতিতার মতো যেন না হয়! বইয়ের লেখায় এ-সব পতিতা নারী ন্যাকামির আবরণে এমন বেশে দেখা দেয়...সে-মিথ্যা, কপটাচারের মার্জ্জনা নাই!...

সনৎকে এ-কথা বুঝাইয়া বলিয়াছি। বলিয়াছি, পতিতার ছবি যদি আঁকো তো তাকে পতিতা করিয়াই আঁকো! সাধ্বী-পতিতা আঁকিয়ো না। আঁকো পতিতা...পতিতাই! সে দেবী নয়...মানবীও নয়!

সনৎ বলিয়াছে, এবারে সে সত্যকার পতিতার ছবি আঁকিবে! ঐ নর্ম্মদার মতো! তার মন হইবে এমনি পাথরে রচা! এমনি মিথ্যা আর ছলনায় সে পটু! গান-নাচ...এগুলা পাথরের গায়ে ফুটিয়া ওঠে...সে-ফোটার পরিচয় পতিতা জানে না. পতিতা তার কোনো সন্ধানও রাখে না!

বাঙলা সিনেমার গল্প

কলিকাতা এটর্ণি-পাড়া। এটর্ণি খড়্গেশ্বর বাবুর অফিস। খাশ-কামরায় বসিয়া আছেন এটর্ণি খড়্গেশ্বর বাবু। সামনে টেবিলের উপর রাশীকৃত দলিল ও কাগজ; এবং সামনের চেয়ারে বসিয়া আছে তরুণী শ্রীমতী মলিনমালা।

খড়্গেশ্বর বাবু বলিলেন,—শ্রীমতী মলিনমালা, আজ তুমি উনিশ বৎসর বয়স অতিক্রম করে কুড়ি বৎসরে পড়লে এবং তোমার এষ্টেট-পত্তরের যে গার্জেনগিরি আমি করছিলুম, আজ তার শেষ হলো। তাই তোমাকে আজ আমার অফিসে আনিয়েছি, তোমার এষ্টেট-পত্তর বুঝিয়ে তোমার হাতে তুলে দিয়ে দায়মুক্ত হবার জন্য।

খড়্গেশ্বর বাবুর কথায় কেমন যেন একটু করুণ-কাতর সজল ভাব! চোখেও কেমন অশ্রুর আবছা!

খড়্গেশ্বর বাবু ডাকিলেন,—শ্রীপদ···

এক বৃদ্ধ কেরাণী খাশ-কামরায় প্রবেশ করিল।

খড়্গেশ্বর বলিলেন,—শ্রীমতী মলিনমালার বাবা মকরন্দ মিত্রের এষ্টেটের কাগজ-পত্তর আমাকে দিন।

বৃদ্ধ কেরাণী বলিল,—সে সব কাগজ আপনার ডান-দিককার ড্রয়ারে আছে।

এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ কেরাণী ড্রয়ার হইতে একটা বড় বাণ্ডিল বাহির করিয়া খড়্গেশ্বরের সামনে টেবিলে রাখিয়া প্রস্থান করিল।

বাণ্ডিল খুলিয়া শ্রীমতী মলিনমালার পানে চাহিয়া খড়োশ্বর বাবু বলিলেন,—প্রথমে ধরি চার হাজার টাকা। এ টাকাটা তুমি পেয়েছো তোমার কাকা করুণারুণ বাবুর উইলে। এ টাকাটা বিলকুল খোয়া গেছে।

মলিনমালার দুই চোখ বিস্ফারিত হইল। খড়োশ্বর তাহা লক্ষ্য করিলেন; বলিলেন,—কি করে খোয়া গেল, তা তোমাকে একটু বুঝিয়ে বলা দরকার।

মলিনমালা বলিল,—দেখুন, আমি ছেলেমানুষ। আমি শুধু গান শিখেছি আর ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছি। বিষয়-সম্পত্তির কিছুই আমি জানি না। টাকা যদি খোয়া গিয়ে থাকে তো গেছে!

খড়োশ্বর বাবু বলিলেন,—মানে, কি জানো, ব্যাপারটা তোমার জানা দরকার। অর্থাৎ আমি একটা কোলিয়ারী নিয়েছিলুম। শস্তা দর ছিল। নিজের হাতে তখন বেশী টাকা ছিল না। তাই তোমার ঐ টাকাটা কোলিয়ারীতে দিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম, যদি লাভ হয়, তোমার ও-টাকা শোধ করে দেবো! আর যদি যায়, তোমার বরাত! অর্থাৎ তোমার মঙ্গল হবে, এ ইচ্ছা ছিল না, তা নয়।...কিন্তু... টাকাটা গেল। মানে, ঠকতে হলো! কে জানতো যে খনির মধ্যে কয়লার বদলে আছে কতকগুলো কাঁকড়া!

সবিস্ময়ে মলিনমালা বলিল,—কাঁকড়া!

খড়োশ্বর বলিলেন,—হ্যাঁ, কাঁকড়া!...তার পর তোমার মাতামহর দেওয়া ছিল এক হাজার টাকা। ভাবলুম, সে টাকাটা ডার্বি, সেণ্টলেজার এবং এমনি আরো কতকগুলো লটারীতে খাটিয়ে বাড়িয়ে দেবো। তোমার টাকা তোমার থাকবে, বাড়তি যা পাওয়া যাবে, আমার হবে! কিন্তু বরাত খারাপ...ও-টাকাটাও নষ্ট হলো।

মলিনমালা বলিল,—আপনি ভালো মনে করেই তো টাকাটা···

বাধা দিয়া খড়্গেশ্বর বলিলেন,—নিশ্চয়! আমরা এটর্ণি··· মক্কেলের ভালো করা···আমাদের পেশা! কিন্তু তবু লজ্জায় আমি মরে আছি! তার পর ঠ্যাখো না, তোমার পিসিমার দেওয়া তিন হাজার টাকা! সে টাকায় রেশের ঘোড়া কিনলুম; ঘোড়ার নাম কলি-ফ্লাওয়ার—বরাবর বাজী জিতেছে। ভেবেছিলুম, তোমার যে টাকাটা ওদিকে লোকসান গেছে, এই ঘোড়ার দৌলতে তার দশগুণ তুলে আনবো। কিন্তু কেনবার পর প্রথম রেশে কলি-ফ্লাওয়ার যেমন নামলো, কেমন বে-টক্করে পড়ে পা গেল ভেঙ্গে! শেষে বেচারা পশুর সে-যাতনা অসহ্য লাগতে তাকে গুলি করে মারতে হলো। এই সে কাগজ-পত্র··· এতে সমস্ত হিসেব তুমি দেখতে পাবে—সহিসের মাইনে থেকে ঘাস ছোলার দাম পর্য্যন্ত—সব এতে লেখা আছে।

মলিনমালা বলিল,—থাক, যা গেছে, তার হিসেব দেখে কি লাভ? আমি ছেলেমানুষ,—দুনিয়ার কি বা জানি? বরং বলুন টাকা-কড়ি কি আর আছে!

খড়্গেশ্বর বলিলেন,—হায় রে, কিছু নেই মা, কিছু নেই! সব গেছে। তার উপর আরও দুর্ভাগ্যের কথা এই, মকরন্দ বাবু তোমার বাবা ছিলেন না! অর্থাৎ তুমি মকরন্দ বাবুর মেয়েই নও!

বিনা-মেঘে বাজ পড়িলে মানুষ যেমন চমকিয়া ওঠে, মলিনমালা তেমনি চমকিয়া উঠিল। আর্ত্তস্বরে বলিল,—এঁ্যা! আর আমার অভাগিনী মা?

নিশ্বাস ফেলিয়া খড়্গেশ্বর বলিলেন,—যাঁকে তুমি তোমার মা বলে জানো, তিনি তোমার মা নন···কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাকে কোনো প্রশ্ন

করো না। শুধু এইটুকু জেনে রাখো যে তোমার জন্ম-কাহিনী ভয়ঙ্কর রহস্যে ভরা।

দুচোখে জল···মলিনমালা বলিল,—আপনি বলতে চান জগতে আমি আজ অনাথিনী?

খড়্গেশ্বর বলিলেন,—তাই। দুনিয়ার পথে তুমি আজ একা। তবে কখনও যদি পরামর্শ নেবার দরকার হয়, আমার কাছে এসো। আমি তোমার এটর্ণি।

মলিনমালা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল।

খড়্গেশ্বর বলিলেন,—কি করে দিন চলবে?

নিশ্বাস ফেলিয়া মলিনমালা বলিল,—সিনেমা আছে, আরতি-নৃত্য আছে, ক্যানভাসিং আছে···দেখি, যদি কোনোটায় সুবিধা করতে পারি!

খড়্গেশ্বরের অফিস হইতে বাহির হইয়া মলিনমালা কম্পিত চরণে সোজা চলিয়া গেল ইডেন গার্ডেনের দিকে। লোকের সঙ্গ ভালো লাগিতেছিল না। তাই সে গিয়া বসিল নিরালা একটা লতা-কুঞ্জের আড়ালে।

মনে চিন্তার বন্যা বহিল।···

তার পর দিনের সূর্য্য গড়াইতে গড়াইতে কখন নদী পার হইয়া হাওড়ার ওদিকে অদৃশ্য হইবার উপক্রম করিয়াছে···এমন সময় মলিনমালার হুঁশ হইল···তাই তো, সামনে রাত্রি! রাত্রে কোথায় আশ্রয় মিলিবে?···বাড়ীতে?···কিন্তু সে কার বাড়ী? খড়্গেশ্বর বলিল, সে

মকরন্দ বাবুর মেয়ে নয়! এবং যে-মাকে মা বলিয়া জানিত, সে তার মা নয়।...কে তার মা, কে তার বাবা, আর সে নিজেই বা কে, তাও জানে না! গভীর রহস্য!

তার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল। সে ভাবিল, এমন বিপদে মানুষ কখনো পড়ে নাই। এ বিপদে কি যে করিবে, ভাবিয়া সে স্থির করিতে পারিল না! আকাশের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

আকাশে মুক্তির উপায় মিলিল না। তখন ভাবিল, পুকুরের ওই কালো জল...ওই জলের নীচে মুক্তি মিলিবে না?...ওখানে কি আছে, কেহ জানে না। তারও জীবন অমনি রহস্যের তিমিরে ঢাকা! সে রহস্য কি, কেহ জানে না! সে-ও জানে না! ওই কালো জলে নিজেকে যদি সঁপিয়া দেয়...এ রহস্য কেহ জানিবে না!

সে আসিয়া জলের কোলে দাঁড়াইল। মনে হইল, যখন খড়্গেশ্বরের অফিসে আসে, তখন মনের বনে ফুটিয়াছিল লক্ষ লক্ষ আলোর ফুল... আর এখন?

হঠাৎ কাণের কাছে কে ডাকিল,—সুন্দরি...

ডাকের সঙ্গে সঙ্গে সে হাত ধরিল।

চমকিয়া নলিনমালা কহিল,—কে?

চাহিয়া দেখে...

লোকটা বলিল,—আমি ওৎ পেতে ছিলুম...তোমাকে নিয়ে যাবো।

নলিনমালা বলিল,—কোথায়?

সে বলিল,—প্রেমের অমরাবতীতে।

নলিনমালা বলিল,—আমি যাবো না।

—আমি ধরে নিয়ে যাবো। বলিয়া লোকটা মলিনমালাকে পাঁজাকোলা করিয়া তুলিল।

মলিনমালা হাত-পা ছুড়িয়া চীৎকার করিল—ওগো কে আছো, আমায় রক্ষা করো!

সঙ্গে সঙ্গে স্বর শুনিল,—ভয় নেই!

এবং চোখের পলক-পাতে যেন সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল কোন্ দেবতা!

দুর্বৃত্তকে প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া মলিনমালাকে সে উদ্ধার করিল।

দুর্বৃত্তের গলা টিপিয়া ঝাঁকানি দিয়া আগন্তুক কহিল,—পুলিশের হাতে দেবো?

লোকটি বলিল,—আজ্ঞে, না! এখনি খপরের কাগজে ছেপে ঢিঢিক্কার হবে! মানে, আমার মান-ইজ্জত আছে। এমন কাজ আর করবো না।

—সাবধান! বলিয়া লোকটার কাণ মলিয়া আগন্তুক দুর্বৃত্তকে ছাড়িয়া দিল।

মলিনমালা তখনও কাঁপিতেছিল। আগন্তুক বলিল—রাত হয়ে গেছে, এখানে আর থাকবেন না।

মলিনমালা বলিল,—আপনি আজ আমায় রক্ষা করেছেন! আমি গরীব, অনাথিনী, কি-বা দেবো! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আপনার মঙ্গল হোক! আপনাকে কিছু দেবো—কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ, এমন আমার কিছু নেই।

মলিনমালার দুই চোখে শ্রাবণের ধারা!

আগন্তুক বলিল,—না, না, কাঁদবেন না। আপনাকে রক্ষা করতে

পেরেছি, এ গৌরবের স্মৃতি আমার বুকে চিরদিন জ্বল্-জ্বল্ করবে। সে-ই আমার পরম পুরস্কার!

মলিনমালা বলিল,—শুনে আনন্দ হলো। না হলে আমার মনে গ্লানির অন্ত থাকতো না।...তবে একটি মিনতি আছে...

আগন্তুক বলিল,—বলুন।

মলিনমালা বলিল,—যে-অভাগিনীকে আজ আপনি রক্ষা করলেন, তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করবেন না!, সে কোথায় যায়, তার সন্ধান নেবেন না! তাকে ভুলে যাবেন...শুধু এইটুকু দয়া করবেন।

আগন্তুক বলিল,—তাই হবে। যান আপনি চলে...আমি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকবো! আপনি কোন্ দিকে গেলেন, দেখবো না।

মলিনমালা দু পা অগ্রসর হইল...আগন্তুক অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

মলিনমালা আবার ফিরিল, বলিল,—আর একটা কথা...

আগন্তুক ফিরিয়া মলিনমালার পানে চাহিল। কহিল,—বলুন...

ছল-ছল চোখে মলিনমালা বলিল,—যিনি আমাকে এ বিপদে আজ রক্ষা করেছেন, তাঁর নাম জানতে পারি না?

আগন্তুক তীব্রস্বরে কহিল,—না, না, না...জানবার মতো আমার নাম নয়...আমার নামে মোহ নেই...আকর্ষণ নেই...আমার তুচ্ছ নাম আমি বলবো না।

এ কথা বলিয়া আগন্তুক বেগে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

মলিনমালা হতভম্বের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিল, ভদ্রলোক এমন বেত্রাহত কুকুরের মত পলাইল কেন?

সহরের প্রান্তে বস্তী। এই বস্তীর এক জীর্ণ গৃহের দাওয়ায় মলিনমালা বসিয়া আছে। সামনে অন্ধকার ভবিষ্যৎ···সে অন্ধকারে কি করিয়া চলিবে, তাহারি চিন্তায় তার তরুণ মন জর্জ্জরিত।

এক বর্ষীয়সী আসিয়া বলিল,—না খেয়ে বসে বসে ভাবলে দুঃখ ঘুচবে না মলিনা। খাবে এসো। বেশী কিছু নয়—মাছের ঝোল দিয়ে দুটি ভাত। না খেলে কি করে বুঝবে?

মলিনমালা নিশ্বাস ফেলিল। ভাবিল, ধরণীর পাষাণ-বুকে মমতার নির্ঝর এখনও আছে? এই বর্ষীয়সী নারী···তার আত্মীয় নয়, কেহ নয়, তবু তাকে আশ্রয় দিয়াছে···তার মুখে অন্ন তুলিয়া দিতেছে!

চোখে আবার অশ্রুর ধারা বহিল। ভাবিল, এত জল চোখের পিছনে কোথায় সঞ্চিত ছিল?

বর্ষীয়সী বলিল,—এসো, খাবে এসো।

মলিনমালা কহিল,—চলুন।

খাওয়া চুকিলে বর্ষীয়সী বলিল,—শরীরে বল পেলে?

মলিনমালা বলিল,—হ্যাঁ।

বর্ষীয়সী বলিল,—এখন কি করতে চাও?

মলিনমালা বলিল,—কতকগুলো রুমাল আর ফ্রক তৈরী করে ছিলুম, সেগুলো নিয়ে বেরুই। দেখি, বেচতে পারি কি না···

মলিনমালার চেষ্টার অন্ত নাই। ঘরে বসিয়া ব্লাউস, ফ্রক সেলাই করিয়া বাজারে সেগুলো বেচিতে যায়। তার গরজ দেখিয়া দোকানীরা দাম দিতে চায় অল্প।

মলিনমালা কি করিবে? সেই দামেই সেগুলা বেচিয়া আসে।

সে গল্প লেখে, লিখিয়া সম্পাদকদের দ্বারে দ্বারে ঘোরে। সম্পাদকরা বলেন,—নতুন লেখকের লেখা ছাপা হয় না। তুমি নতুন লিখছো কি না!

সম্পাদকদের টেবিলে লেখা রাখিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া মলিনমালা চলিয়া আসে।

নিত্য এই দশা। সকালে আশার উচ্ছ্বাসে মন ভরিয়া ওঠে · যেন শিশিরে-ভেজা তাজা ফুল! দিনের শেষে নৈরাশ্যের দাহে সে ফুল মলিন ম্লান হয়···এখনি যেন ঝরিয়া পড়িবে!

সেদিন সন্ধ্যায় দুশ্চিন্তার বোঝা মনে বহিয়া মলিনমালা বাড়ী ফিরিল।

বর্ষীয়সী বলিল,—একটি সুখবর আছে। আমার এক ভাই সিনেমার কাজ করে। ওরা নতুন বাংলা ছবি তুলবে—একজন ভদ্র মহিলা আর্টিষ্ট খুঁজছে। তুমি করবে এ-কাজ?

মলিনমালা বলিল,—করবো না? আপনি বলেন কি! আমায় যদি কেউ হাওড়া-ষ্টেশনে কুলির কাজ দেয় কিম্বা হাওড়ার নতুন পুল তৈরী করবার জন্য মজুরনীর কাজ দেয়, সে কাজও আমি মাথায় তুলে নেবো।

বর্ষীয়সীর মন বেদনায় যেন ভাঙ্গিয়া যাইবে···

বর্ষীয়সী বলিল,—আহা, বাছারে!···আজ খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে ঘুমোও। কাল সকালে উঠে চান-টান করে বেশ সভ্য-ভব্য সেজে আমার ভাইয়ের সঙ্গে ষ্টুডিয়োতে যেয়ো। ঐ চাকরিতে নাম হবে, পয়সাও হবে। তোমার ছবি লোকে ঘরের দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখবে।···

সুখ-স্বপ্নে সে-রাত্রি কাটিলে পরের দিন সকালে সজ্জিত বেশে মলিনমালা গিয়া ট্রামে চড়িল।

টালিগঞ্জের ডিপোর সামনে ট্রাম হইতে নামিয়া সে চলিল ষ্টুডিয়োর দিকে...আশার উচ্ছ্বাসে মন বিভোর...চেতনা যেন বিলুপ্তপ্রায়... হঠাৎ মাথার উপরে একেবারে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল!

—উঃ, মাগো! বলিয়া মলিনমালা পথের উপরে লুটাইয়া পড়িল। চোখের সামনে দুনিয়ার আলো দপ্ করিয়া নিবিয়া গেল।

...চোখ মেলিয়া আবার যখন চাহিল, দেখে, টালিগঞ্জের সে ছায়া-শ্যামল পথ নয়, সজ্জিত ঘরে ফুলের মতো কোমল বিছানায় সে শুইয়া আছে!

ক্ষীণ কণ্ঠে মলিনমালা কহিল,—আমি কোথায়?

কাছে ছিলেন বাড়ীর গৃহিণী। বলিলেন,—আগে এই দুধটুকু খাও. তার পর সব কথা বলছি।

মলিনমালা দুগ্ধ পান করিল। পানের পর শরীরে বল পাইয়া চারিদিকে চাহিল।

গৃহিণী কহিলেন,—আমার নাম মিসেস্ মাণিক্যদীপ্তি সান্ন্যাল। সকাল বেলায় মোটরে চড়ে টালিগঞ্জে বেড়াতে যাচ্ছিলুম, তুমি চলেছিলে পথে...আমার ড্রাইভার মোটরে হর্ণ দেবা-মাত্র তুমি চমকে যেমন সরে যাবে, মোটরের মাড-গার্ডে ধাক্কা লেগে পড়ে গেলে: পড়েই অজ্ঞান। একে চোট্ লেগেছে, তার পর পাছে পুলিশ-কেস্ হয়, তাই ড্রাইভারকে দিয়ে তোমায় গাড়ীতে তুলে এখানে নিয়ে এসেছি। ভয় নেই, তেমন চোট তোমার লাগে নি। শক্‌এর দরুণ অজ্ঞান হয়েছিলে।... এখন বলো দিকিনি কোথায় তোমার বাড়ী? গাড়ী করে তোমায় পৌঁছে দেবো।

মলিনমালার দু' চোখে জল ঠেলিয়া আসিল। সে বলিল,—আমার বাড়ী নেই, ঘর নেই, আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। আমি পরের দয়ায় পরের ঘরে আশ্রয় পেয়েছিলুম। চাকরির জন্য টালিগঞ্জে যাচ্ছিলুম। সে চাকরি আর মিলবে না। আমি যেতে পারি নি··· আমার জায়গায় এতক্ষণে আর কাউকে তারা 'এনগেজ' করেছে। কি যে আমার হবে···

মলিনমালার দু' চোখে বন্যার ধারা···সে-ধারার বিরাম নাই!

গৃহিণী বলিলেন—কেঁদো না। আমার এত বড় বাড়ী···এখানে যদি আপত্তি না থাকে, তোমার আশ্রয় মিলবে। তুমি আমার 'কম্প্যানিয়ন' হয়ে থাকবে।

কৃতজ্ঞতায় মলিনমালা একেবারে গলিয়া গেল! গৃহিণীর পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া বলিল,—ওগো করুণাময়ী, মমতাময়ী···

মলিনমালার হাত ধরিয়া গৃহিণী তাকে তুলিলেন, বলিলেন,—এ উচ্ছ্বাসের প্রয়োজন নেই! তোমার নাম কি?

—আমার নাম মলিনমালা।

গৃহিণী বলিলেন,—আজ থেকে তুমি এ-বাড়ীর লোক এবং নিজেকে এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে জেনো।

বিধাতা-পুরুষ অলক্ষ্যে বসিয়া এ-কথা শুনিলেন! তাঁর মাথায় কি দুষ্ট-বুদ্ধি চাপিল! এ-কথা শুনিয়া হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন, নিরাপদ! বটে! জানো না, তুমি তপ্ত কড়া হইতে উনুনের মধ্যে পড়িলে মলিনমালা!

সেই উনুনের কথা পরের পরিচ্ছেদে বলিব।

চলুন পাঠক, চলুন পাঠিকা আমাদের সঙ্গে ব্যারাকপুরে 'রিভার সাইডে' ঐ সজ্জিত বাংলো-বাড়ীতে।

রাত্রিকাল। দশটা বাজিয়াছে। প্রশস্ত হল-ঘরে মিষ্টার লাহিড়ী তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সুরাপানে মত্ত। বাজী রাখিয়া 'ব্রিজ' খেলা চলিতেছে। মিষ্টার লাহিড়ী বার-বার হারিতেছে। এবারে হারিয়া লাহিড়ী বলিল—আর আমি খেলবো না। বাড়ী যাবো।

মিষ্টার চম্পটি বলিল—ব্যাপার কি? তোমার মন আজ খেলায় দেখছি না!

ইহাদের কথাবার্ত্তা বুঝিতে হইলে একটু পরিচয় জানা প্রয়োজন।

মিষ্টার লাহিড়ী আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিতা মিসেস্ মাণিকালীর সান্যালের ভাই। লাহিড়ী ভগ্নীর স্নেহে লালিত হইয়া ভগ্নীর গেহে বাস করিতেছে। এবং এরূপ ক্ষেত্রে চিরদিন যা হয়, তাই অর্থাৎ গড়াচর চণ্ড! বিলাসিতায় এবং বাবুয়ানায় মিষ্টার লাহিড়ী ভগ্নী ও ভগ্নীপতির কাছে অজস্র প্রশ্রয় লাভ করিয়া পরম আরামে বাস করিতেছে। ব্যারাকপুরে ভগ্নীপতির এই বাগান-বাড়ীটি আজ তারি বিলাস-নিকেতন হইয়াছে।

চম্পটির কথায় লাহিড়ী বলিল—ইউ আর রাইট! খেলায় আমার মন নেই।

চম্পটি বলিল,—মন কোথায়?

লাহিড়ী বলিল,—সেদিন দিদির গাড়ী চাপা পড়ে এক অনাথিনী কিশোরী দিদির সঙ্গিনী-রূপে আমাদের গৃহে অধিষ্ঠিতা। তার নাম নলিনমালা। আমি সেই নলিনমালার কথা ভাবছি।

চম্পটি বলিল,—কি ভাবছো?

লাহিড়ী বলিল,—এই নলিনমালাকে নিয়ে আমি দুনিয়ার পথে বেরিয়ে পড়তে চাই। তুমি আমাকে সাহায্য করবে?

চম্পটি চমকিয়া উঠিল! বাপরে, যদি পুলিশ-কেশ হয়?

লাহিড়ী বলিল,—ভয় নেই। টাকা-কড়ির সাহায্য চাইছি না। এ কাজে শুধু আমার সঙ্গে থাকবে। প্রয়োজন হলে সাহায্য করবে।

চম্পটি কহিল,—কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, এ হাঙ্গামের কি প্রয়োজন?

লাহিড়ী বলিল,—তুমি বুঝছো না! আমার উদ্দেশ্য খারাপ নয়। শুভ-পরিণয়…

চম্পটি বলিল,—আমিও ওই কথা বলছি। মানে, তোমার দিদিকে বললে তিনিই তো এই কিশোরীর সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতে পারেন। তোমার দিদি হলেন বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা! তার উপর নিঃসন্তান! এবং তুমি তাঁর একমাত্র সহোদর-ভ্রাতা! অর্থাৎ বড়লোক ভগ্নীপতির একমাত্র সম্বন্ধী! তোমাকে অদেয় ওঁদের কিছুই নেই! আকাশের চাঁদ চাইলে তোমার দিদি বিলেত থেকে অর্ডার দিয়ে ক্রেন, দূরবীন-যন্ত্র এবং anything at any cost আনিয়ে চাঁদকে পেড়ে তোমার হাতে দিতে পরাঙ্মুখ হবেন না!

লাহিড়ী বলিল,—আহা, বুঝছো না…এই কিশোরী পরিচয়-হীনা! …এঁর ন পিতা, ন মাতা, ন বন্ধু, ন ভ্রাতা! আপনাতে আপনি বিকশি আমাদের বাড়ীতে একদা প্রাতে উদয় হয়েছেন যেন অফুরন্ত-রূপসী উর্ব্বশী! তাই দিদি এ-বিবাহে মত দেবে না।

চম্পটি কহিল,—ও! তোমার সুভদ্রা-হরণের ব্যবস্থা?

লাহিড়ী বলিল,—হ্যাঁ। বিশুদ্ধ পৌরাণিক মতে।

চম্পটি বলিল,—বেশ, বন্ধু। কাল রাত্রেই ব্যবস্থা করো।

লাহিড়ী বলিল,—রাত দশটায়। কেমন? বাড়ীর দোরে আমার মোটর 'রেডি' থাকবে। যে-ভাবে ব্যবস্থা হবে, পরে তোমায় বলবো।

পরের দিন লাহিড়ী মলিনমালাকে গৃহে দেখিতে পাইল না। এ ঘর, ও ঘর···প্রতি ঘরে সন্ধান করিল। কোথাও তার সন্ধান মিলিল না। বৈকালে দিদির কাছে গিয়া ডাকিল—দিদি···

সন্ধ্যার শোতে সিনেমায় যাইবেন বলিয়া দিদি মিসেস সান্যাল সাজ-সজ্জা করিতেছিলেন, লাহিড়ীর আহ্বানে দিদি কহিলেন,—কেন রে?

লাহিড়ী বলিল,—মানে, তোমার সেই কিশোরী সহচরীটিকে দেখছি না যে!

দিদি বলিলেন,—ও তা, তাকে তোর কি দরকার?

লাহিড়ী বলিল,—আমার দরকার নয়। তবে মানে, তুমি একলাটি সিনেমায় যাবে? দুজনে গেলে ছবিটা ভালো 'এন্‌জয়' করতে!

দিদি বলিলেন,—না। সে যে-বস্তীতে থাকতো, সেইখানে দেখা করতে গেছে। সেই বস্তী থেকেই নিরুদ্দেশ হয়েছিল তো! আমি বললুম, যাও, দেখা করে এসো: কিন্তু কালই ফিরে আসা চাই। বলে গেছে, আসবো।

লাহিড়ী বলিল,—কোথায় বস্তী···সে-বস্তী খুঁজে কি করে যাবে?

দিদি বলিলেন,—রমজান ড্রাইভার মোটরে করে তাকে নিয়ে গিয়ে ঠিক জায়গাতে পৌঁছে এসেছে।

লাহিড়ী বলিল,—ও!

তার পর দিদি পাউডারের পাফ্ হাতে লইলেন এবং লাহিড়ী নিঃশব্দে চলিয়া আসিল। তার মনের মধ্যে ফোর্টের ব্যাণ্ড বাজিতেছিল···

সে ভাবিল, চমৎকার সুযোগ! বিধাতার ইঙ্গিত! রমজান ড্রাইভারকে পাঁচ টাকা বখশিশ দিলে বস্তীর সন্ধান মিলিবে। এবং সেই বস্তী হইতে আজ রাত্রে মডার্ণ মোটর-পথে তুলিয়া লাহিড়ী-অর্জ্জুন মডার্ণ-সুভদ্রা হরণ করিবে! এবং সে-রথে সারথি হইবে পরম বন্ধু মিষ্টার চম্পটি!

···রাত্রি দশটায় বস্তীর দ্বারে মোটর আসিয়া হর্ণ বাজাইল। মলিনমালা বাহিরে আসিয়া বলিল,—কে? রমজান?

জবাব মিলিল না। মুখে মুখোশ-আঁটা লাহিড়ী এবং চম্পটি তাকে ধরিয়া মোটরে তুলিল; এবং চকিতে মোটর ছুটিল তীরের বেগে!

ব্যারাকপুর। গঙ্গার ধারে মোটর থামিল। মুখের মুখোস খুলিয়া লাহিড়ী ডাকিল,—উর্ব্বশী···

রাগে দু'চোখে আগুন জ্বালিয়া কণ্ঠ-স্বরে সে আগুনের ঝাঁজ মিশাইয়া মলিনমালা বলিল,—তুমি ভুল করেছো পথিক। আমি উর্ব্বশী নই! আমি মলিনমালা।

স্বর শুনিয়া চম্পটি মলিনমালার মুখে টর্চ্চের আলো ফেলিল—ফেলিয়া চমকিয়া উঠিল! নিজের মুখের মুখোশ ছিঁড়িয়া বলিল,—তুমি?

এ-কথায় মলিনমালা চম্পটির মুখের পানে চাহিল। চিনিল। ইডেন গার্ডেনে দুর্বৃত্তের হাত হইতে ইঁনিই সেদিন তাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন!

ক্ষোভে দুঃখে মলিনমালা কাঁদিয়া ফেলিল। তার মুখে কথা ফুটিল না।

চম্পটি কহিল,—কাঁদছেন কেন?

বাষ্পার্দ্র স্বরে মলিনমালা বলিল,—কাঁদবো না? একদিন জটায়ু-বেশে যিনি আমায় রক্ষা করেছিলেন, আজ সেই জটায়ু রাবণের সহায় হয়ে আমাকে সীতা-হরণ করছে! আপনার এ অধোগতি দেখে যদি না কাঁদবো তাহলে কিসে কাঁদবো, বলতে পারেন?

চম্পটি বলিল,—আপনি কাঁদবেন না। আমি জানতুম না যে আপনিই তিনি! আমার বন্ধু লাহিড়ী বললে, আপনাকে হরণ করে এনে শুভ-বিবাহ করবে। আমার সাহায্য চেয়েছিল। তাই আমি এসেছিলুম। কিন্তু আর নয়, আমি এবারো আপনাকে রক্ষা করবো।

হুঙ্কার দিয়া লাহিড়ী বলিল,—কী!

চম্পটি বলিল—খবর্দ্দার! আমি বড়লোকের দুগ্ধপোষ্য সম্বন্ধী নই যে ননীর পুতুল! আমার গায়ে দস্তুরমতো জোর আছে।...গাড়ী থেকে নেমে শীগ্‌গির চলে যাও। না হলে পাঁজাকোলা করে তুলে তোমায় ওই গঙ্গার জলে ঝুপ করে ফেলে দেবো। যতক্ষণ আমি আছি...নারীর বন্ধু...ততক্ষণ এই কিশোরীকে তুমি স্পর্শ করতে পারবে না!

লাহিড়ী জানে, চম্পটির গায়ে জোর আছে... বেশ জোর! এবং সে যদি ক্ষেপিয়া ওঠে, তাহা হইলে পুলিশকে পর্য্যন্ত প্রহার করিতে ছাড়ে না, সে তো লাহিড়ী মাত্র! মনের আক্রোশ মনে চাপিয়া লাহিড়ী গাড়ী হইতে নামিয়া দূরে মাঠে গিয়া বসিল।

চারিদিক্ স্তব্ধ। মাথার উপর আকাশে রাশি-রাশি নক্ষত্র।

নিশ্বাস ফেলিয়া মলিনমালা বলিল,—দ্বিতীয় বার আবার যিনি আমায় রক্ষা করলেন, তাঁর নাম ?

বাধা দিয়া চম্পটি বলিল,—না, না ! আমার নাম নেই, পরিচয় নেই। আমায় কোনো কথা জিজ্ঞাসা করবেন না···বলিয়া চম্পটি সেই নিশীথের অন্ধকারে গা ঢাকিয়া সেদিনকার মতোই তীরের বেগে আবার কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল !

কি করিয়া মলিনমালা সে-রাত্রে মিসেস সান্যালের গৃহে ফিরিয়া আসিল, সে যেন স্বপ্ন !

এবং মলিনমালা ফিরিয়া আসিয়াছিল মিসেস্ মাণিক্যদীপ্তি সান্যালের গৃহে, নহিলে এ-গল্প এইখানেই শেষ হইত !

লাহিড়ীও ফিরিয়াছিল নিশ্চয়···দিদির বাড়ী ছাড়া দুনিয়ায় কোথায় আর তার আশ্রয় আছে !

মিসেস্ মাণিক্যদীপ্তি সান্যাল রাত্রের ঘটনার কথা জানিলেন না। মলিনমালা সে-কথা তাঁকে বলিল না।

দিন কাটিতে লাগিল···

মলিনমালার মনে স্বস্তি নাই ! ভবিষ্যতের পানে যত তাকায়, শুধুই দেখে, অন্ধকার ! এ অন্ধকারে কোথা দিয়া যে আলোর উদয় হইবে, নানা রকমে ভাবিয়া মলিনমালা উপায় খুঁজিয়া পায় না !

মনের অস্বস্তি ক্রমে অসহ্য হইল। সে গিয়া মিসেস সান্যালকে বলিল,—আমায় অনুমতি দিন, আমি চলে যাবো।

মিসেস সান্যাল বলিলেন,—কোথায় যাবে ?

নিশ্বাস ফেলিয়া মলিনমালা বলিল,—জানি না!

মিসেস সান্যাল বলিলেন—কোথায় যাবে জানো না, তবু যেতে হবে! না, যেতে পাবে না। তুমি উপন্যাসের নায়িকা নও যে কোথায় যাবে না জেনে পথে বেরুবে! তুমি সত্যিকারের মানুষ··· মেয়ে-মানুষ···এত সাম্য-স্বাধীনতা, শ্রদ্ধা-ভক্তি, সম্মান-মর্য্যাদার বক্তৃতা করছে পুরুষ, তবু পুরুষকে জেনো অসহায় মেয়ে-মানুষের সে শত্রু! মেয়েদের ওরা ভাবে, যেন ওদের খাদ্য! বিশ্রী পুরুষ! তার উপর তোমার মনে এখনো ব্যথা রয়েছে···মনের সে-ব্যথা আগে সারুক, তার পরে যেয়ো। এখন এইখানে থেকে মনকে তুমি সুস্থ করো।

মলিনমালা বলিল,—এ-মন কি করে সুস্থ হবে? গৃহহীন, বন্ধুহীন, অর্থহীন, সুখহীন, আশাহীন···এ মন সুস্থ হবার নয়!

মলিনমালার দু' চোখে আবার ধারা বহিল।

রুমালে চোখের সে জল মুছাইয়া দিয়া মিসেস সান্যাল বলিলেন,—দু'দিন অপেক্ষা করো। সামনে পূজোর ছুটী। সেই ছুটীতে রাঁচি যাবো। আমার সঙ্গে তুমিও যাবে, তার পর ফিরে এসে তোমার যা খুশী, তুমি করো। যেখানে খুশী, যেয়ো। তার আগে এখান থেকে যাওয়া হবে না।

মলিনমালা বলিল,—আচ্ছা, তবে তাই হোক।···

···রাঁচি···

পাশের বাংলায় থাকেন মিষ্টার চক্রবর্ত্তী। তিনি ভীষণ সাহেব। স্ত্রীর সঙ্গেও অনেক সময় ইংরেজীতে কথা বলিয়া ফেলেন! কিন্তু স্ত্রী মিসেস চক্রবর্ত্তী ঘোর বাঙালী। এ-যুগে এত-বড় বাঙালী-সাহেবের

স্ত্রী হইয়াও তিনি পূজা-অর্চ্চনা করেন, মুসলমানের ছোঁয়া জল স্পর্শ করেন না, অন্দরে মুরগীর মাংস আনিতে দেন না!

মিসেস সান্যালের সঙ্গে মিসেস চক্রবর্ত্তী বেথুন স্কুলে পড়িতেন! দুজনে তখন খুব ভাব ছিল; এবং এখনো সে-ভাবে এতটুকু অভাব ঘটিল না!

সেদিন মোরাবাদীর মাঠে বসিয়া দুজনে কথা হইতেছিল। কাছে বসিয়া ছিল মলিনমালা···দূরে বরিয়াতু পাহাড়ের দিকে তার একাগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ!

শ্রীমতী চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—মেয়েটিকে আমার এত ভালো লাগে! সাধ হয়, আমার ছেলে অটবীর সঙ্গে বিয়ে দি।

মিসেস সান্যাল বলিলেন,—মেয়েটির মনে দুঃখের সীমা নেই! বেচারীর কেউ কোথাও নেই। আমি এত স্নেহ করি, যত্ন করি··· কিন্তু সে স্নেহ অনুগ্রহের মতো ওর বুকে বাজে!

শ্রীমতী চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—অটবীর সঙ্গে বিয়ে হলে কোনো দুঃখ থাকবে না।

তিনি ডাকিলেন,—মা মলিনমালা···

মলিনমালা তাঁর দিকে চাহিল।

শ্রীমতী চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—আমার মেয়ে নেই। তুমি আমার মেয়ে হবে?

মলিনমালা বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে তাঁর পানে চাহিয়া রহিল।

শ্রীমতী চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—মানে, ঠিক মেয়ে নয়! অর্থাৎ অটবীর সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবো।

মলিনমালা সভয়ে বলিল,—না, না, না।

—না কেন?

মলিনমালা বলিল,—তা আমি বলতে পারবো না।

মলিনমালা আবার কাঁদিল। কান্না তার এমন অভ্যাস হইয়া গেছে যে একটুতেই চোখে জলে টল-টলিয়া ওঠে! ভাবিল, এমন অযাচিত স্নেহ···হায়রে, সে-স্নেহ লইবে, ভগবান্ সে-অধিকারেও তাকে বঞ্চিত করিয়াছেন!

পরের দিন। মলিনমালা জান্‌লার ধারে বসিয়া আপন-মনে গান গাহিতেছিল

আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল
শুধাইল না কেহ···

মিসেস সান্যাল আসিয়া বলিলেন,—ওঁরা এসেছেন অটবীকে নিয়ে। তুমি এসো।

মলিনমালা বলিল,—না, না।

মিসেস সান্যাল বলিলেন,—না কেন? আমাকে বলতেই হবে··· বলো।

নিশ্বাস ফেলিয়া মলিনমালা বলিল,—আমার হৃদয় আর নেই। সে হৃদয় আমি দান করেছি!

মিসেস সান্যালের বিস্ময়ের সীমা নাই! তিনি বলিলেন,—কাকে আবার হৃদয় দান করলে? একা থাকো··· দানের যোগ্য মানুষ পেলে কোথায়?

—পেয়েছি···বড় দুর্দ্দিনে! তাঁর নাম জানি না, পরিচয় জানি না···তিনি আমাকে দু'-দুবার বড় বিপদে রক্ষা করেছিলেন!

মিসেস্ সান্যাল বলিলেন,—এ তোমার পাগলামি! আমি শুনবো না। তুমি এসো।

মলিনমালাকে এক-রকম টানিয়া হিঁচড়াইয়া আনিয়া মিসেস্ সান্ন্যাল তাকে বসাইয়া দিলেন হল-ঘরে। সে-ঘরে অনেক লোক।

শ্রীমতী চক্রবর্ত্তী বলিলেন অটবীকে—মলিনমালাকে ঘ্যাখো অটবী···

অটবী দেখিল। দেখিয়া চমকিয়া উঠিল! কহিল,—আপনি?

পরিচিত স্বর! মলিনমালার বুক কাঁপিল। মলিনমালা চোখ তুলিয়া চাহিল! চোখের সামনে···এ কি! তিনি···সেই তিনি!··· সে বলিল,—আপনি এখানে!

মিসেস্ সান্যাল এবং মিসেস্ চক্রবর্ত্তী দুজনে একসঙ্গে বলিলেন,—দুজনে দুজনকে চেনো?

সলজ্জভাবে দুজনেই বলিল,—চিনি।

তখন সব কথাই জানা গেল। অর্থাৎ এক বিকট কালো মেয়ের সঙ্গে মিষ্টার চক্রবর্ত্তী অটবীনাথের বিবাহ স্থির করিয়াছিলেন···তারা লক্ষ টাকা যৌতুক দিবে বলিয়াছিল। বাপের কাছে রূপসী পুত্র-বধূর চেয়ে যৌতুকের দাম বাঙলা দেশে চিরদিনই অনেক বেশী! মেয়েটির নাম কৃষ্ণকাদম্বিনী। সেই কৃষ্ণকাদম্বিনীর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উদ্দেশ্যে অটবীনাথ বাড়ী হইতে চম্পট দিয়া চম্পটি-নামে যত্র-তত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

বিবাহ চুকিয়া গেল এবং পাকস্পর্শের ভোজ হইল কলিকাতা সহরে।

সে ভোজে খড়্গেশ্বর এটর্ণিও আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন,—আমাকে ক্ষমা করো মলিনমালা, তুমি মকরন্দ মিত্রেরই কন্যা। তোমার টাকা নষ্ট করেছিলুম বলে পাছে আমার নামে তুমি পুলিশ-কোর্টে নালিশ করো, তাই ওই কথা বলেছিলুম। অর্থাৎ, সেই কোলিয়ারী থেকে এখন আর কাঁকড়া ওঠে না, কয়লা উঠচে। সেই কোলিয়ারী এখন তোমার নামে লেখাপড়া করে তার দলিল তোমায় দিচ্ছি, এই নাও। অটবীনাথকে বলো, কোলিয়ারীটার দিকে যেন নজর রাখে! ও থেকে টন্-টন্ কয়লা উঠবে। আর সে কয়লা কলকাতায় আনতে পারলে ওঃ, এই যুদ্ধের বাজারে ওই কোলিয়ারীর কয়লা বেচে তোমরা দুজনে একেবারে লালে লাল হয়ে উঠবে!

আলো

শেয়ালদা ষ্টেশনে রাত্রি আটটার ট্রেণে চড়িয়া শশাঙ্ক চলিয়াছে মদনপুর। ঝম্‌-ঝম্‌ করিয়া বাদল নামিয়াছে···শনিবারের ট্রেণ··· ইণ্টার-ক্লাশের কামরায় ভিড়ে, চ্যাপ্‌টাইয়া কোনোমতে একটু ঠাঁই করিয়া বেচারী বসিয়াছে! বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিটিতেছিল!

পাঁচ বৎসর পরে সে দেশে ফিরিতেছে। ইহার মধ্যে যেন প্রলয়ের ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে!

মদনপুর ষ্টেশনে ট্রেণ হইতে যখন নামিল, তখনো বর্ষার বিরাম নাই। প্লাটফর্ম্মের বেঞ্চে সে বসিয়া রহিল। মনের মধ্যে পাঁচ বৎসরের ঘটনাগুলা আলো-আঁধারে ভূতের মতো ছায়া-শরীরে ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল।

শশাঙ্ক কলিকাতার কলেজে প্রোফেসরি করে। মা-বাপ তার উপর ভবিষ্যতের সকল নির্ভর গড়িয়া তুলিতেছিলেন। বাড়ীতে আরো দু'টী ভাই আছে। শশাঙ্ক সবার বড়।

কলিকাতায় থাকিয়া শশাঙ্ক লেখাপড়া করিত। এম-এ দিবার পর মা-বাপ ধরিলেন,—বিবাহ কর্‌। পাত্রী তাঁরা দেখিয়া রাখিয়াছেন —গ্রামের মেয়ে। শশাঙ্কও মেয়েটিকে ভালো করিয়া জানে!

শশাঙ্ক বাঁকিয়া বসিল। কলিকাতায় বন্ধু যতীশ ছিল তার মস্ত 'এ্যাডমায়ারার'···যতীশের বাপ বড়লোক···তার বোন অমিতাকেও শশাঙ্ক বহুবার দেখিয়াছে! অমিতার গান সে শুনিয়াছে। যতীশের

ঘরে যে-আসর বসিত, সে-আসরে সাহিত্য আর 'পলিটিক্স' লইয়া বহু আলোচনা করিয়াছে যতীশ ও অমিতার সঙ্গে। অমিতা···আহা, যেন এঞ্জেল! তার পাশে ঐ গ্রামের মেয়ে···

যতীশ বার-বার বলিত, অমিতার সঙ্গে যদি তোমার বিবাহ হয়? যতীশের বাপ-মা জীবনে যে-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহাতে শশাঙ্কর পানে লোলুপ দৃষ্টিতে তাঁরা চাহিতেন। ইউনিভার্সিটির একটি রত্ন···

পল্লীগ্রামে থাকে। তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না! পাশ করিয়া মানুষ হইয়াছে! সহরে থাকিবে···দিন কিনিবার মত সম্বল শশাঙ্ক সংগ্রহ করিয়াছে! অতএব···

শশাঙ্ক জিদ ধরিয়া বসিল, অমিতাকে বিবাহ করিবে। বাপ বলিলেন—না।

মা বলিলেন—বড়-মানুষের মেয়ে···এ ঘরে থাকতে চাইবে না, নাক সিঁটকুবে!

শশাঙ্ক বলিল—বড়-মানুষের মেয়ে হলেও অমিতার মন পঙ্কিলতার ঊর্দ্ধে··

মা বলিলেন—তাতে সুখ হবে না, বাবা! বিয়ে দিয়ে দু'দিন বৌ নিয়ে ঘর করবার সাধ তো আমাদের আছে!

শশাঙ্ক বলিল—গেঁয়ো মেয়ে আমার মনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারবে না।

কথায় কথায় কথা বাড়িয়া গেল। বাপ চটিলেন···মা কাঁদিলেন··· শশাঙ্কর হইল অভিমান।··এ কি অত্যাচার! বিবাহ করিয়া যে-স্ত্রীকে লইয়া আজীবন তাকে বাস করিতে হইবে, তাকে নির্ব্বাচন করিয়া লইবার অধিকার শশাঙ্কর নাই!

এত বড় দাস্ত শিরোধার্য্য করিতে তার বাধিল। সে বলিল—এ তোমাদের জুলুম!

মা কোনো কথা বলিলেন না। বাপ বলিলেন—সে-মেয়েকে যদি বিয়ে করো, তাহলে আমাদের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রেখো না!

তবু ছেলের জিদ বজায় রহিল। শশাঙ্ক বিবাহ করিল সেই অমিতাকে। এবং বিবাহের ফলে এখানকার সঙ্গে তার সম্পর্ক-বন্ধনও কাটিয়া গেল।

বাপ সেকেলে লোক···তেজী···গৃহস্থ মানুষ। বড়-মানুষের দ্বারে মাথা নত করিবার মতো একেলে-বুদ্ধি তাঁর ছিল না! জিদ বজায় রাখিতে শশাঙ্ককে সত্যই মন হইতে ছাঁটিয়া দিলেন। মা কাঁদিলেন। বাপ বলিলেন—শশি যদি মারা যেতো, তাহলে তাকে হারাতে তো!

শিহরিয়া মা বলিলেন—ছি ছিঃ, তাকে ছেঁটে ফেলতে চাও, ছাটো ···তা বলে জীবন-মরণের কথা নিয়ে···

এমনি করিয়া সংসারে ট্রাজেডি ঘটিয়া গেল।

কথাটা অমিতার কাণে যায় নাই, এমন নয়। কিন্তু তাহাতে তার কোথাও বাধে নাই। যাদের সে জানে না, তাদের অনুরাগ-বিরাগ তাকে স্পর্শও করিল না! তাছাড়া একালের হাওয়ার সে মানুষ! স্বামীকেই সে চায়! স্বামীর কোথায় কে আত্ম-জন আছে, না-ই বা মিলিল তাদের!

পাঁচ বৎসর শশাঙ্ক দেশের দিকে মুখ ফিরায় নাই। আজ দেশে আসিবার কারণ, ছোট ভাই দু'খানি চিঠি লিখিয়াছে, মায়ের খুব

অসুস্থ। তিন মাস তিনি শয্যাগত। যদি কিছু হয়, মা একবার দাদাকে দেখিবার জন্য আকুল…

প্রথম চিঠিতে শশাঙ্কর বুকে একটু দোলা লাগিয়াছিল! পূর্ব্বকার কথাগুলি তলাইয়া দেখিতেছিল।…যে-সুখের আশায় এতখানি ত্যাগ এমন রূঢ়ভাবে করিয়া বসিয়াছে, সে-সুখ সত্যই পাইয়াছে?

দ্বিতীয় পত্র পাইবামাত্র মন সেই অতীতের স্মৃতি-মন্দিরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। তাই সামনে শনিবার পাইয়া শনিবারেই সে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সেখানে বলিয়া আসিয়াছে, বিশেষ প্রয়োজনে বিদেশে চলিয়াছে।

দেশে আসিতেছে, এ-কথা শশাঙ্ক কাহারো কাছে ভাঙ্গে নাই ---অমিতার কাছেও নয়!

আজও এখানে এ-ব্যাপার লইয়া টিটকারী-বিদ্রূপ ওঠে। শ্বশুর বলেন—Most unnatural parents! অমিতা বলে—তুমি চোর, না, খুনী আসামী যে মা-বাপ এমন করে সম্পর্ক ছেঁটে দিলেন?

শশাঙ্ক চুপ করিয়া শোনে, জবাব দেয় না। কে যেন থাকিয়া থাকিয়া মনের গোপন গহন-তল হইতে ডাকিয়া বলে, চোরেরও অধম তুমি!

ঘণ্টাখানেক পরে বৃষ্টির বেগ কমিল। শশাঙ্ক উঠিল। উঠিয়া প্ল্যাটফর্ম্ম পার হইয়া মেটে পথে নামিল। পথ কাদায় পিছল। মেঘ চিরিয়া আকাশের ফাঁকে-ফাঁকে নক্ষত্রের ঝিকিমিকি রশ্মি ঝরিয়া পড়িয়াছে!

দূরে লণ্ঠন-হাতে লোক চলিয়াছে…দু'জন। তাদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক।

শশাঙ্ক ভাবিতেছিল, গৃহে গিয়া কি দেখিবে? পাঁচ বৎসরে কত পরিবর্ত্তন! মা?…আছেন তো?

এ-প্রশ্ন মনে জাগিতে সে শিহরিয়া উঠিল।…

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল নিজের কথা। পাঁচ বৎসরে সে কি পাইয়াছে স্ত্রীর কাছে?…যে-স্ত্রীর জন্য নিজের সর্ব্বস্ব সে ত্যাগ করিয়াছে! মা-বাপের অজস্র স্নেহ…তাদের বিপুলতার কথা মনে জাগিল। ছোট দু'টী ভাই! তাদের কতখানি বঞ্চিত করিয়া মা-বাপ কি অজস্র-দানে শশাঙ্ককে ভরিয়া দিয়াছিলেন…তার জীবন-পথটুকুকে সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিতে! আশা ছিল, শশাঙ্ক মানুষ হইলে ভাই দু'টীর মানুষ হওয়ার দিকে কোনো বাধা ঘটিবে না! ভাই দু'টীর হাত ধরিয়া জীবনের পথে শশাঙ্ক তাদের মানুষের মতো দাঁড় করাইয়া দিতে পারিবে!

এত সাধ, এত আশা…কিসের লোভে শশাঙ্ক কাটিয়া নির্ম্মূল করিয়া দিয়া সহরে চলিয়া আসিল। মা-বাপ তো তাকে ত্যাগ করেন নাই! সে-ই তাঁদের সকলকে ত্যাগ করিয়াছে! প্রথম যৌবনের মত্ত বাসনায়, খেয়ালের নেশায়…

সে প্রোফেসর…লেখাপড়ার গর্ব্ব করে! অথচ কি তুচ্ছ খেয়ালে, কি স্বার্থের প্ররোচনায় অমিতাকে সে বিবাহ করিয়া বসিল!

অমিতা লেখাপড়া জানে,—অমিতা গান গাহিতে জানে,—বাজনা বাজাইতে জানে,—আবার প্রজাপতির মতো পাখায় বিচিত্র রামধনুর বর্ণাভাস জাগাইতে জানে! তার রূপ, তার…

কিন্তু শশাঙ্কর মনের সঙ্গে এ পাঁচ বৎসরে সে কি সহযোগিতা করিয়াছে? নিজেকে বড় করিয়া, নিজের খেয়ালকে অগ্রবর্ত্তী করিয়াই অমিতা চলিয়াছে চিরদিন ··প্রতি পদক্ষেপে শশাঙ্ককে খর্ব্ব করিয়া!··· শশাঙ্ক মানুষ···শশাঙ্ক স্বামী···শশাঙ্কর মন আছে, সত্তা আছে—সেদিকে অমিতা কোনোদিন ভ্রূক্ষেপ করে না! শশাঙ্ককে অবজ্ঞা করিয়াই সে চলে! স্বামী হইয়া অমিতার কাছে শশাঙ্ক আজও রহিয়া গিয়াছে সেই পল্লীগ্রামের দরিদ্র যুবা—নেহাৎ যেন কৃপার পাত্র!

অথচ সংসারের কি বিচিত্র মধুর স্বপ্নই না শশাঙ্ক দেখিত! স্ত্রী দাসী হইয়া থাকিবে···শুধু সেবা-পরিচর্য্যায় স্বামীকে তৃপ্ত রাখিবে, এমন কখনো শশাঙ্ক চাহে নাই! সে চাহিয়াছিল স্ত্রী হইবে মনের সহচরী-সঙ্গিনী! কিন্তু অমিতাকে বিবাহ করিয়া না পারিল সে নিজে উর্দ্ধে উঠিয়া অমিতার মনের নাগাল পাইতে··· না অমিতা নামিয়া আসিল শশাঙ্কর মনের পাশে! পৃথিবীর সমতল ভূমিতে কোনোদিনই স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি দাঁড়াইতে পারিল না!

এই কি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক!

জীবন যেন ক্রমেই বিশ্রী বিরস হইয়া আসিতেছে। এ বয়সে জীবনকে এমন তিক্ত বোধ হয়! আশ্চর্য্য!

একটি ছেলে হইয়াছে। তার ছেলে···অথচ শশাঙ্ক যেন তার কেহ নয়! সে যেন শুধু অমিতারই! অমিতার পিতৃ-বংশের সে পরমাত্মীয়! শশাঙ্কের যেন কোনো অধিকার নাই তার সম্বন্ধে কোনো-কিছু করিবার!

শশাঙ্ক যদি আজ মারা যায়, ছেলের তাহাতে কোনো ক্ষতি হইবে না! ··ছেলের জীবনে কোনো অভাব ঘটিবে না!···

এই তো তার জীবন!...অভিশাপের মতো অহরহ বিদগ্ধ করিতেছে! চারিদিকে আকাশ-বাতাস এ-অভিশাপের ঝাঁজে যেন রুক্ষ কঠিন পাষাণ হইয়া গিয়াছে! বাঁধা রুটীনে মন দিনের কাজ করিয়া যায়! মনে আশা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই! চেতনা নাই, কামনা নাই! কদর্য্য বীভৎসতায় ভরিয়া আছে!

আজ পাঁচ বৎসর পরে দেশের ভিজা মাটীতে পা দিয়া মনে হইতেছিল, পাষাণ-আবরণ ভেদ করিয়া দেহ-মন যেন তার স্বাভাবিক চেতনা-স্পন্দন ফিরিয়া পাইয়াছে! গায়ে সজল বাতাসের স্পর্শ—মায়ের স্নেহ-হস্ত-স্পর্শের মতোই স্নিগ্ধ আরাম দিতেছিল!

এমনি চিন্তায় বিভোর...শশাঙ্ক চলিয়াছে গ্রামের পথে...সহসা কে ডাকিল—শশীদা...

শশাঙ্ক চমকিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখে, সেই লণ্ঠন। একটি ছেলের হাতে লণ্ঠন, আর তার পাশে দাঁড়াইয়া শুক্লবসনা কিশোরী!

শশাঙ্কর দুই চোখ বিস্ফারিত হইল। শশাঙ্ক ডাকিল—শৈল...

শৈল হাসিল...ম্লান, মৃদু হাসি।

শশাঙ্ক বলিল—এই বর্ষায় রাত্রে মাঠের মধ্যে...

শৈল বলিল—কলকাতায় গিয়েছিলুম। ফিরছি।

শশাঙ্ক বলিল—কলকাতায়!

শৈল বলিল—হ্যাঁ।

তার পর কাহারো মুখে কথা নাই!

শশাঙ্ক চলিয়াছে যন্ত্র-চালিতের মতো।

শৈল বলিল—হঠাৎ দেশে ফিরলে এ্যাদ্দিন পরে?

কে যেন শশাঙ্কর কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল ! কোনো মতে কণ্ঠ মুক্ত করিয়া সে বলিল—মার অসুখ···মৃগাঙ্ক চিঠি লিখেছে।

মৃগাঙ্ক শশাঙ্কর ছোট ভাই।

শৈল বলিল—রাগ তাহলে পড়েছে ?

শশাঙ্ক বলিল—আমি তো রাগ করিনি। বাবাই রাগ করে আমাকে বাড়ী আসতে বারণ করেছিলেন।

শৈল দাঁড়াইল, বলিল—পুরুষ-মানুষ ! রামচন্দ্রের মতো তাই পিতৃ-আজ্ঞা পালন করছো !

কথাটা তীরের মতো শশাঙ্কর গায়ে বিঁধিল ! সে বলিল—তুমি পারতে এ-কথা ঠেলতে ?···তোমার বাবা যদি এমন কথা তোমায় বলতেন ? তোমার অভিমান হতো না ? বলো···

শৈল কোনো কথা বলিল না।··একটা উষ্ণ নিশ্বাস অতি-কষ্টে চাপিয়া সে বলিল—দাঁড়ালে কেন ? চলো···

আবার চলা সুরু হইল···নীরবে।

এবারে শশাঙ্ক প্রথমে কথা কহিল। ডাকিল—শৈল···

শৈল বলিল—কি ?

শশাঙ্ক বলিল—এমন হলো কবে ? শুনিনি তো।

শৈল বলিল—খপর নিয়েছো কখনো যে শুনবে !

সে কথা ঠিক ! শশাঙ্ক বলিল—দেশের কোনো খপরই তো পাই না ! কার কাছেই বা পাবো, বলো ?

শৈল বলিল—তা তো বটেই ! সেখানে বড়লোক হয়ে আছো ···বড়-বড় দলে মেলা-মেশা করছো ! কাছে আছে বড়-মানুষের মেয়ে···স্ত্রী···

শশাঙ্ক এ-কথার কোনো জবাব দিল না।···জবাব নাই ! এই

শৈলকেই…মা বলিয়াছিলেন শশাঙ্কর সঙ্গে বিবাহ দিয়া বধূ করিবেন! এই শৈলকে শশাঙ্ক প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল…তুচ্ছ-বোধে! কিন্তু এই যে কথাগুলা…

শশাঙ্ক বলিল—কোথায় বিয়ে হয়েছিল?

শৈল বলিল—তোমায় তিনি জানতেন। তিনিও ছিলেন এক কলেজের প্রোফেসর, শশীদা।…তিনিও এম-এ তে ফার্ষ্ট হয়েছিলেন।

কথাগুলা শৈল বলিল বেশ দৃপ্ত ভঙ্গীতে!

শশাঙ্কর বুকের পাঁজরাগুলাকে এ-কথা যেন আঘাত করিল বেশ জোরে!

শশাঙ্ক কহিল,—তাঁর নাম?

শৈল হাসিল, হাসিয়া বলিল—স্বামীর নাম বুঝি উচ্চারণ করতে আছে!…তবে এদিকে নয়…তিনি ছিলেন ঢাকায়। তারপর বদলি হন হুগলিতে…কৃষ্ণনগরে। কৃষ্ণনগরেই মারা যান।

শশাঙ্ক বলিল,—কিসের প্রোফেসর বলো তো!

শৈল বলিল,—মুখ্যু মেয়েমানুষ…তা তো জানি না, শশীদা। তবে প্রোফেসর ছিলেন, কলেজে পড়াতেন, এই জানি। ঢাকায় যখন চাকরি করেন, তখন বিয়ে হয়। বিয়ের পর আমাকে ঢাকায় নিয়ে যান। তার পর সঙ্গে সঙ্গেই থাকতুম! কখনো পরিচয় ঘ্যান নি! নিজের লেখাপড়া, কাগজপত্র নিয়ে সারাক্ষণ তন্ময় থাকতেন।…আশে-পাশে যে-মানুষ আছে—সে স্ত্রী, বোধ হয়, আমি মুখ্যু বলেই তা খেয়াল করেন নি! দুটি ছেলেমেয়ে হয়েছিল…রইলো না। বোধ হয়, অত পাণ্ডিত্যের ঝাঁজ তারা সইতে পারলো না! তারা তো আর বাঙালীর ঘরের স্ত্রী নয়, তাই চলে গেল!

শৈল ক্ষণেক স্তব্ধ রহিল। তারপর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—আমার

কোনো দুঃখ নেই সেজন্য! আশে-পাশে দেখতে তো পাই, আমাদের কি দাম···মা-বাপের কাছে, ভাইয়ের কাছে, স্বামীর কাছে!

এই অবধি বলিয়া শৈল হাসিল, হাসিয়া বলিল,—তুমি তো বৌকে মানুষের মত ভ্যাখো? তুমিও প্রোফেসর-মানুষ···পণ্ডিত!

শশাঙ্কর মন যেন পাথর হইয়া গিয়াছে! পাঁচ বৎসর পরে দেশে ফিরিতেছে···পাঁচ বৎসরে এখানকার আকাশ-বাতাস বদলাইয়া গিয়াছে, তা সে জানে। কিন্তু সে-পরিবর্ত্তন এমন যে গ্রামের মেয়ে শৈল পর্য্যন্ত সমাজের এতখানি পলিটিক্সের কাঁটা বিঁধাইয়া কথা বলে! তাও নারীর যা চরম দুর্ভাগ্য, সেই দুর্ভাগ্য শিরে বহিয়া!

সে কোনো জবাব দিল না।

শৈল বলিল—তবে তোমার বৌ হলো বড়-মানুষের মেয়ে! তার উপর লেখাপড়া-জানা! তাকে না মেনে থাকবার উপায় নেই!··· সত্যি, বলো না শশীদা, আমি তো জানি না। এমনি শুনেচি···

সামনে ছিল একটা খানা···জলের তোড়ে উপরকার মাটীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কথার আবেগে শৈলর সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। শশাঙ্ক দেখিল, দেখিয়া বলিল—সামনে খানা···দেখো শৈল···

শৈল সতর্ক হইল।···বলিল,—জীবনকে কত কি মনে হতো! একটু আঘাতে বুক একদিন যেন ভেঙ্গে যেতো! সব সয়েছি শশীদা। গেঁয়ো-মেয়ে বলে তুমি যে-দিন তুচ্ছ করে চলে যাও·· মেয়ে-জন্ম নিয়ে এ-উপেক্ষা···কতখানি সে আঘাত! যেন বাজারের জিনিষের মতো যাচাই করা!···লজ্জায় আমি মরে গিয়েছিলুম! কোনো কথা কইনি। আমাদের দেশ বলেই মেয়েরা এত সইতে পারে, বুঝি! কিন্তু···থাক্ সে-কথা···

শশাঙ্করও ভালো লাগিতেছিল না। সে বলিল—কলকাতায় কোথায় গিয়েছিলে ?…কার সঙ্গেই বা ?

শৈল বলিল,—কার সঙ্গে আবার ! এই যে ছেলেটি…সম্পর্কে ভাই হয়। কোথায় গিয়েছিলুম, জানো ? ওঁর একটা লাইফ-ইনসিওর ছিল। তোমার বাবা তাদের সঙ্গে অনেক চিঠি-লেখালেখি করেন ! তারা টাকাটা উড়িয়ে দেবে ঠিক করেছিল, তাই নিজে গিয়েছিলুম। যাকে দেখবার কেউ নেই, তাকে নিজেকেই তো সব দেখতে হবে ! তা যা শুনে এলুম, চমৎকার !

শশাঙ্ক বলিল—কি…শুনি…

শৈল বলিল—ওঁর নাকি অনেক টাকা দেনা ছিল, পলিশির টাকাও তাই অনেক দিন থেকে বন্ধ ছিল·· পলিশি নাকচ হয়ে গেছে !…শুনতুম বটে শশীদা, পৈতৃক দেনা ছিল। অনেক টাকা…পণ ছিল, না শুধে তিনি কারো পানে চাইবেন না !…কথাটা ভালো। কিন্তু এত বড় পণ নিয়ে এ গরীবের মেয়েকে না-ই বা বিয়ে করতেন ! বিয়েই যখন করলেন, তখন তার পানেও চাওয়া উচিত ছিল তো ! আমার জীবনটা এ চার বৎসরে যেন দম-ছাড়া হয়ে গেছে ! কতই বা আমার বয়স, শশীদা !

শশাঙ্ক গুম হইয়া রহিল।

আকাশে মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে ক'টা নক্ষত্র দেখা দিয়াছে। উদ্দাম বাতাস হা-হা করিয়া ছুটিয়া যায়…আ'লের কানায়-কানায় বর্ষার সঞ্চিত জল…ভেকের মিশ্র-রাগিণী অবিরাম জাগিয়া স্তব্ধতার বুক চিরিয়া দিতেছে।

দূরে গ্রাম-সীমায় বনরেখা। জোনাকির আলোয় মনে হয়, কে যেন কালো-শাড়ীর উপরে সোনালি চুমকি আঁটিয়া দিয়াছে ! বনের

ওপারে গ্রাম। গ্রামের বুক হইতে মাঝে-মাঝে কুকুরের কর্কশ ডাক ভাসিয়া আসে।

শশাঙ্ক ভাবিতেছিল, এই শৈলকে সে উপেক্ষা করিয়াছিল কিসের লোভে? কোন্ সুখের প্রত্যাশায়? অমিতার মধ্যে সে···

শৈল ডাকিল—শশীদা···

শশাঙ্ক বলিল,—কেন?

শৈল বলিল—এখনো গান গাও?

শশাঙ্ক জবাব দিল না।

শৈল বলিল—মাঠে তোমার গান কি সুন্দর শোনাতো! আজো আমার মনে আছে একটি গান···কলকাতায় কার কাছে শিখে এসেছিলে···

শশাঙ্কর বুকে স্মৃতির তরঙ্গ দুলিয়া উঠিল। শশাঙ্ক বলিল—কোন্ গানটা শৈল?

শৈল বলিল,—সেই যে

কোথাকার উতল হাওয়া
ডাক দিল যে, ডাক দিল যে
প্রাণের মাঝে, মনের মাঝে!

শুনিয়া শশাঙ্ক শুধু বলিল—হুঁ···

উতল হাওয়া আজও বহিতেছে! কিন্তু সেদিনকার যে-ডাক এ হাওয়ায় বহিয়াছিল, আজ আর সে-ডাক বহে না তো!

শৈল বলিল,—বলো না, এখনো গান গাও? বৌকে শোনাও?

হাওয়ার একটা ঝলক!

সে-ঝলকে বুকের মধ্যকার অনেকখানি নিশ্বাস মিশাইয়া শশাঙ্ক

বলিল,—না। এখন জীবনে শুধু যুদ্ধ চলেছে শৈল, তার আঁচে প্রাণে সুর যা' ছিল, জ্বলে গেছে !

শৈল ফিরিয়া চাহিল। চাহিয়া বলিল,—কিন্তু তোমার তো আঁচ লাগবার কথা নয় ! নিজে বেছে নিয়েছো তোমার ভবিষ্যৎ···

শশাঙ্ক বলিল,—তার মানে ?

শৈল বলিল—স্বামী-স্ত্রী···এই নিয়েই মানুষের ভবিষ্যৎ !···সংসারে দুঃখ বলো, ধান্দা বলো, দু'জনে যদি দু'জনের হাত ধরে চলে, তাহলে সে-দুঃখ বাজবার কথা নয়, শশীদা।

নয় ! কিন্তু মানুষের বুদ্ধি কত কম, তা মানুষ যে আগে বুঝিতে পারে না ! বোঝে বহু বিলম্বে···তখন বুঝিয়া কোনো লাভ নাই !

এ কথার জবাব নাই। শশাঙ্ক জবাব দিতে পারিল না। শৈলর সঙ্গে নীরবে হাঁটিয়া চলিল।

মাঠের শেষে গাছ-পালায় রচা যেন গ্রামের তোরণ !

তোরণ পার হইয়া খানিকটা আসিলে বাঁয়ে শশাঙ্কদের বাড়ী। স্তব্ধ গৃহ।

শৈল বলিল—বাড়ী এলে অনেকদিন পরে। কাল থাকবে তো ?

শশাঙ্কর বড় ভালো লাগিতেছিল··এই হাওয়া, এই মাটী, এই বনের গন্ধ ! সে বলিল—থাকবো !

শৈল বলিল,—তাহলে দেখা হবে। আজ আসি শশীদা।

শৈল চলিয়া গেল সোজা···লণ্ঠনের আলোয় সামনেকার আঁধার চিরিয়া···

ঐ···ঐ যায় শৈল !

শশাঙ্ক নিশ্বাস ফেলিল—সেই শৈল···

জীবনের সকল কাজ, সকল সাধ চুকাইয়া আজ বসিয়া আছে নিরবলম্ব···নিঃসহায়!···আশা নাই! কিছু নাই!

সে-ও যে এত ত্যাগ সহিয়া, নিজের সমস্ত অতীতকে বিসর্জ্জন দিয়াছে··· তারই বা কি আশা আছে আজ!

বাকের মুখে শৈলর হাতের আলো অদৃশ্য হইয়া গেল। আবার সেই অন্ধকার!

নিশ্বাস চাপিয়া শশাঙ্ক দ্বারে ধাক্কা দিল, ডাকিল—মৃণু···

ভিতরে সাড়া জাগিল,—যাই।

সেই গৃহ··· স্নেহ-প্রীতির স্মৃতিতে ঘেরা! এ গৃহের দ্বার কতদিন বন্ধ আছে! এখন সে-দ্বার আবার মুক্ত হইবে! মুক্ত দ্বার-পথে সে-গৃহে প্রবেশ করিয়া শশাঙ্ক আজ কি পাইবে? শান্তি? আরাম? না···?

বুকের মধ্যটা দুলিয়া উঠিল। ওদিকে দ্বারের ফাটলে-ফাটলে আলোর রেখা!

কে আসিতেছে দ্বার খুলিতে···তার হাতে আলো!

অসম্ভব নয়

বন্ধু গোকুল "বঙ্গ-বাজারে" কাজ করে। থিয়েটার-বায়োস্কোপের পাশ পায়। দুজনে এক মেশে থাকি। ফ্রী-পাশে তার সঙ্গে আমারো থিয়েটার দেখা ঘটে।

ব্লু থিয়েটারে একটি লোক চমৎকার বাঁশী বাজায়। ভালো লাগে। গোকুলকে বলি—ও-সব এ্যাক্টিং যা করে, গায়ে কাঁটা দেয়! তোমার সঙ্গে থিয়েটারে আসি শুধু ঐ ভদ্রলোকটির বাঁশী শোনবার লোভে!

গোকুল বলে—হ্যাঁ। ওর নাম নারাণ। খাশা বাঁশী বাজায়। ...ভালো কথা, ওর জীবনে একটু ইতিহাস আছে। দু'মাস আগে শুনেছি। অনেক সময় ভাবি, একটা ছোট গল্প লিখে ফেলি। কোনো মাসিকে ছাপালে দু'দশ টাকা পেয়ে যাবো!

আমি বলি—কি সে কাহিনী, বলো না?

গোকুল আমার পানে চায়। তার চোখের দৃষ্টিতে খানিকটা দ্বিধা, খানিকটা সংশয়!

আমি বলি—কি ভাবছো?

গোকুল বলে—গল্পটা মেরে দেবে না? সত্যি? নারাণের সে কাহিনী নিয়ে চাও যদি ছোটখাট একটা প্লে লিখতে পারো...কিম্বা ফিল্মের শিনারিয়ো। রেডিয়োর ফীচার-প্রোগ্রামের জন্য যদি লেখো তাহলেও এক্সেলেণ্ট হবে!

আমি বলি—তোমার কাহিনী আগে বলো, শুনি।

গোকুল বলে,—

বাগবাজারের খালের ধারে "আরাম-নিবাস" হোটেল। দোতলা ফ্ল্যাট-বাড়ী। এক-তলায় রাস্তার ধারের এক-দিককার ঘরে একটা মণিহারীর দোকান, আর-এক দিককার ঘরে মুদিখানা। ভিতরে উঠান, কল-তলা, আর কটা ঘর। দোতলায় পাঁচখানা ঘর, বারান্দা।

বিশ বৎসর পূর্ব্বে এ-হোটেলটির মালিক ছিল ভূধর গাঙ্গুলি। হোটেল মানে, সকালে গিয়ে চা-পাঁউরুটী খাবে, দুপুরে সুরুয়া-মাংস, সন্ধ্যার সময় চপ-কাটলেট্—তা নয়। দোতলার আর একতলার ঘরে বাস করতো মফঃস্বল থেকে কলকাতায় চাকরি করতে এসেছে, এমনি ক'জন লোক। পাটের কলে বা অন্য অফিসে তাঁরা চাকরি-বাকরি করতেন। স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে ভূধর বাস করতো দোতলার একখানি কামরায়। স্ত্রী করতো রান্নাবান্না। অর্থাৎ হোটেল থেকে ভূধরের বেশ দু'পয়সা আয় দাঁড়িয়েছিল।

ভূধরের মৃত্যু হলে ভূধরের বিধবা স্ত্রী শ্যামাঙ্গিনী হোটেল চালাতে লাগলো। ভূধরের মেয়ে হেমাঙ্গিনী মায়ের কাজে সাহায্য করতো।

পনেরো বৎসর পূর্ব্বে হেমাঙ্গিনীর বিবাহ হয়। পাত্রের নাম ছিল সুরথ। চিৎপুরে পাটের কলে সুরথ চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরি করতো। সুরথ থাকতো ঐ হোটেলেই দোতলার এক কামরায়। সে-কামরায় তার সঙ্গী আর দোসর ছিল অক্ষয়। অক্ষয় কাজ করতো বেলগেছের হাসপাতালে। কেরাণী। দুজনে খুব ভাব ছিল। একসঙ্গে

দুজনে থিয়েটার-বায়োস্কোপ দেখতো—ছুটির দিনে পুকুরে মাছ ধরতো।

হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে দুজনের আলাপ-পরিচয় ছিল। শ্যামাঙ্গিনীকে দুজনেই ভক্তি-শ্রদ্ধা করতো। অর্থাৎ হেমাঙ্গিনী কিশোরী। দেখতে সুশ্রী, কথায়-বার্ত্তায় পটু—কাজেই তার উপরে অনুরাগ সঞ্চার হওয়া খুব স্বাভাবিক! ···দুজনেরই মন আকুল···হেমাঙ্গিনী কার ভাগ্যে উদয় হবে! কিন্তু সে-ভাব দুজনেই গোপন রেখেছিল। কেউ কাকেও ঘুণাক্ষরে জানায় নি!

হেমাঙ্গিনীর জন্য পাত্র স্থির করতে শ্যামাঙ্গিনীকে বেশ খানিকটা বেগ পেতে হয়েছিল। বাইরের পাত্রের দল টাকা-পয়সার ফর্দ্দ বিছিয়ে এমন ব্যূহ রচনা করলে যে তাদের নাগাল পাওয়া দায়! শ্যামাঙ্গিনী তখন তাকালো ঘরের এই দুটি পাত্রের পানে। দুটিই ছেলে ভালো···স্বভাব-চরিত্রে দোষ নেই। দুজনেই চাকরি করছে এবং কারো পিছনে আত্মীয়-বন্ধুর কোনো লেজুড়-বালাই নেই!

কিন্তু দুজনের হাতে তো আর একটি মেয়েকে দান করতে পারে না! দুজনের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নিতে হবে! কাকে বেছে নেবে, ক'দিন বসে-বসে ভেবে-চিন্তে শ্যামাঙ্গিনী তার কোনো হদিশ পেলো না! শেষে সুরথের উপরই প্রজাপতি-দেবতা একদিন প্রসন্ন হলেন। সুরথ কাজ করে পাটের কলে। সেখানে উন্নতির সম্ভাবনা প্রচুর। ওদিকে অক্ষয় ছেলেটির মেজাজ ভারী দিল-দরিয়া-গোছের। পয়সা-কড়ির উপর তার এতটুকু মায়া নেই! পালে-পার্ব্বণে সারা রাত্রি অভিনয়ের ব্যবস্থা হলে গাঁটের পয়সা খরচ করে কত দিন শ্যামাঙ্গিনীকে তার কন্যাসহ অক্ষয় থিয়েটার দেখিয়ে এনেছে! তার উপর অক্ষয়ের কাপড়চোপড়ে রুচি আছে···ভালো

পরে! সে খায়-দায় ভালো! এ-সব দেখে মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মা শঙ্কিত হলো—ছেলেটি যে-রকম উড়নচণ্ডী! নাঃ! তাই অক্ষয়কে ছেড়ে সুরথকেই শ্যামাঙ্গিনী নির্দ্ধারিত করলে হেমাঙ্গিনীর হাতের বরমাল্য-গ্রহণের জন্য।

বিয়ের পাঁচ-সাত দিন পরে একটা রবিবার।

উঠানে নিমন্ত্রিত-জনের প্রচণ্ড ভিড়। কলের সাহেব আর বাবুদের নেমন্তন্ন করে বাড়ীতে এনে সুরথ ভোজে যে-সমারোহ বাধালো, দেখবার মতো!

রাত তখন প্রায় বারোটা। নীচের উঠানে ওস্তাদ ফজল-মিয়া তানপুরোয় টঙ্কার তুলেছে। শ্রান্তদেহে হেমাঙ্গিনী এসে নিজের ঘরে গায়ের গহনা, ভারী বেনারশী শাড়ী খোলবার উদ্যোগ করছে, এমন সময় হঠাৎ দুখানা হাত পিছন থেকে সবলে তার দু'চোখ টিপে ধরলো!

বিরক্ত হয়ে হেমাঙ্গিনী বললে—আঃ!

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালো। ঘুরে দাঁড়াবামাত্র দেখলে, অক্ষয়! তার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠলো! এত-বড় স্পর্দ্ধা! কঠিন দৃষ্টিতে অক্ষয়ের পানে তাকিয়ে হেমাঙ্গিনী বললে—ছোটলোক কোথাকারের! আমি এসেছি ঘরে কাপড় ছাড়তে······

কাঁদো-কাঁদো গলায় অক্ষয় বললে—কি চমৎকার তোমাকে দেখাচ্ছে হেম!···আমি তোমায় কত ভালোবাসি···তোমা-বিহনে আমার জীবন মরুভূমি হয়ে গেল!

হেমাঙ্গিনী বললে—যাও···এ-ঘর থেকে চলে যাও। নাহলে এখনি আমি সকলকে ডাকবো।

অক্ষয় বললে—তুমি যদি নিদয় হও হিমু, তাহলে আমাকে চলেই যেতে হবে।

হেমাঙ্গিনী বললে—হ্যাঁ। তাই যাবে। এবং এখনি।

অক্ষয় বললে—যাবো আমি। কিন্তু মনে করো না, বেলগেছের হাসপাতালে যাবো! তা নয়। অনেক-দূরে যাবো। আর কখনো আমায় দেখতে পাবে না! চির-বিদায় নিয়ে যাবো। কোথায় যাবো. জানো?…আসাম।…না, এ্যারেবিয়ায় যাবো! না, এ্যারেবিয়া নয়, এ্যাবিসিনিয়ায় চলে যাবো…সেই হাবশীর দেশে। বুঝলে?

ঝাঁজালো স্বরে হেমাঙ্গিনী বললে,—যেখানে-খুশী তুমি যেতে পারো। হাবশীর দেশে যাও, কি জাহান্নমের দেশে যাও, আমার তাতে এসে যাবে না! তুমি গেলে আমি খুশী ছাড়া অখুশী হবো না!

এ-কথায় অক্ষয়ের মনে কি যে হলো! একবারে সে আগ্নেয়-গিরির মত জ্বলে উঠলো…পরক্ষণে আবার প্রলয়ের বন্যার মতো ফুলে-ফুঁশে তখনি নেতিয়ে পড়লো!

হেমাঙ্গিনী বললে,—গেলে না এখনো? যাও…যাও, বলছি।

অক্ষয়ের মন হাহাকারে একবারে ফেটে পড়লো! হেমাঙ্গিনীর সামনে নতজানু হয়ে সে বসলো।

অক্ষয় বললে—সুরথ তোমায় কতখানি ভালোবাসতে পারবে? পাটের কলে কাজ করে। হুঁঃ! ভালোবাসার মর্ম্ম ও কি জানে? আজই আমি না হয় হাসপাতালের কেরাণী! কিন্তু জানো, একদিন… আমি নাটক লিখেছি, পঞ্চাঙ্ক নাটক…আর কবিতা লিখেছি অজস্র। তার জোরে…

হেমাঙ্গিনীর দুচোখে অগ্নিশিখা! হেমাঙ্গিনী বললে—এখনো

এখানে বসে এ-সব কথা বলতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না? যাও, চলে যাও,·· যাও, বলছি। না হলে অনর্থ ঘটবে।

এত তেজ! আক্রোশে অক্ষয় জ্বলে উঠলো! ভাবলে, ধরবে নাকি একবার হেমাঙ্গিনীর ঐ কণ্ঠ চেপে···যে-কণ্ঠ বাহুলগ্ন করবে বলে চিত্ত তার তৃষিত?

কিন্তু হেমাঙ্গিনীর অগ্নি-জ্বলা চোখের দৃষ্টিতে কি মোহ! কি কুহক! দু'হাত দিয়ে ঘিরে অক্ষয় হেমাঙ্গিনীকে বক্ষলগ্ন করলে···

সঙ্গে সঙ্গে পিঠের উপর যেন ঘরের ছাদ ভেঙ্গে পড়লো!

হেমাঙ্গিনীকে ছেড়ে চমকে ফিরে অক্ষয় দেখে, সুরথ!

সুরথের এমন মূর্ত্তি অক্ষয় কখনো চোখে দেখেনি! অক্ষয়ের চোখেও আগুন জ্বলছিল! কিন্তু সুরথের সে-মূর্ত্তি দেখে অক্ষয়ের চোখের আগুন জোর পেলে না. ধূমাচ্ছন্ন হলো!

অক্ষয় আর এক-মিনিট সেখানে দাঁড়ালো না···বেত্রাহত কুকুরের মতো বেরিয়ে গেল!

সুরথ চাইলো হেমাঙ্গিনীর পানে। হেমাঙ্গিনী কাঁপছিল···জোর-বাতাসে গাছের কচি পাতা যেমন কাঁপে, তেমনি!

সুরথও দাঁড়ালো না···ছুটলো দুর্বৃত্ত অক্ষয়ের পিছনে।

তারপর [illegible]র কারো দেখা নেই। সুরথ-অক্ষয়···কেউ আর হোটেলে ফিরলো না। বাহিরে পৃথিবীর লোকের বিপুল ভিড়ে দুজনে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেল···হোটেলের কেউ আর তাদের কোনো সন্ধান পেলে না!

দিনের পর দিন যায়। সেই সঙ্গে চলে যায় মানুষের মনের কত

সাধ, কত আশা! সঙ্গে সঙ্গে কত মানুষও পৃথিবী থেকে চির-বিদায় নিয়ে চলে গেল!

বিদায় নিয়ে যাঁরা চলে গেলেন, তাঁদের সঙ্গে শ্যামাঙ্গিনীও গেলেন! হোটেলে হেমাঙ্গিনী এখন একা। এত-বড় পৃথিবীতে আপন বলতে তার আজ কেউ নেই!

উপায় কি? চিরন্তন বিধি-বশে হেমাঙ্গিনীকে হোটেল চালাতে হয়। হোটেল চলে। হেমাঙ্গিনীর সধবার বেশ। সিঁথেয় টক্‌টকে লাল সিঁদুর। সে রকমারি শাড়ী পরে, পরিপাটী ছাঁদে চুল বাঁধে। স্বামী যেন অফিসে গেছে, একটু পরেই ফিরবে···তাকে দেখলে এমনি মনে হয়!

পাড়ায় থাকেন উকিল ত্রিপুরা বাবু। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে হঠাৎ তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ হলো। জীবন একেবারে ছত্রভঙ্গ! মন সর্ব্বদা হাহাকার করে! কাছারি যাওয়া ছেড়ে দিলেন। পশার মাটী হতে বসলো! কার জন্যই বা হায়, ওকালতি করবেন?

কদিন ধরে তিনি এই হেমাঙ্গিনীর কথা ভাবছেন। কতই বা হেমাঙ্গিনীর বয়স? আটাশ! না হয় ত্রিশ! দেহখানি খাশা মজবুত রেখেছে! নিটোল গড়ন! রঙ চমৎকার! তার উপর হেমাঙ্গিনীর হোটেল আছে। চলতি কারবার। পয়সা-কড়ি আছে। মনে হলো, এই হেমাঙ্গিনীর কৃপায় আবার যদি নতুন করে তিনি নীড় বাঁধতে পারেন! আঃ! কি-চমৎকার হয়!

সন্ধ্যার সময় ত্রিপুরা বাবু এলেন হোটেলে। ডাকলেন,—হেম···

হেমাঙ্গিনী বললে,—কি বলছেন উকিলবাবু?

ত্রিপুরা বাবু একটা ঢোক্ গিললেন; বললেন—না, কিছু না। মানে, এই দেখতে এলুম।···তা কেমন আছো?

হেমাঙ্গিনী বললে—মন্দ কি !

ত্রিপুরা বাবু একটা নিশ্বাস ফেললেন, বললেন,—কিন্তু এমনভাবে আর কতদিন থাকবে ? জীবনে তুমি কি-বা পেলে ? এমন একা-একা…ফাঁকা-ফাঁকা…কার আশা করো, হেম ?

একটা নিশ্বাস…হেমাঙ্গিনীর বুকের মধ্যে হা-হা করে উঠলো !

উকিল ত্রিপুরা বাবু বললেন—আমার এ সর্ব্বনাশ হয়ে আমি তো বুঝছি, যতই যে যেখানে থাকুক, ঐ একের বিহনে এত-বড় পৃথিবী… শূন্য ! চুপচাপ আর থাকা যায় না হেম ! যখন বাঁচতে হবে, তখন বাঁচার মতো বাঁচা দরকার। তাই আমি বলি কি, তোমার হোটেল দেখতে পারবো আমি, তোমাকেও দেখতে পারবো। অর্থাৎ দাগ-রাজিতে সব ভাঙ্গাই জোড়া লাগে, বুঝলে ! বাড়ী-ঘর-দেওয়াল, বাসন-কোশন, সংসার, জীবন…সব…সব ! আমাদের দুজনের এই দুটি ভাঙ্গা জীবনকে যদি জোড়া-তালি লাগিয়ে আবার আমরা গড়ে তুলি…?

এ ইঙ্গিত বুঝিতে হেমাঙ্গিনীর এক-পলক দেরী হলো না !

গম্ভীর কণ্ঠে হেমাঙ্গিনী বললে—কিন্তু আমার স্বামী বেঁচে আছে উকিলবাবু। আমি সধবা। সধবা মানুষের কি আবার বিয়ে হয় ? আপনিই বলুন না…আপনি তো সব জানেন ! উকিল মানুষ !

ত্রিপুরা বাবু প্রবীণ উকিল। আশা ছাড়লেন না। বললেন—কি বলে যে তুমি ভাবো, সে বেঁচে আছে ? হুঁঃ ! বেঁচে থাকলে তোমার মতো স্ত্রীর কাছে যে-লোক ফিরে আসে না…তার বেঁচে থাকা আমি বিশ্বাস করি না।

হেমাঙ্গিনী বললে—আমি বিশ্বাস করি।

এ-কথার পর উকিল ত্রিপুরা বাবু মাথা হেঁট করে চলে গেলেন।

দিন যায়।

দোতলার ঘরে নতুন ভাড়াটে এলো…এই নারাণ। থিয়েটারে বাঁশী বাজায়। কোনো কূলে তার কেউ নেই। কিন্তু খাশা ভদ্রলোক।

নারাণের পাশের ঘরে থাকে হেমাঙ্গিনী। থিয়েটার থেকে নারাণ অনেক রাত্রে বাড়ী ফেরে…তার হাতে বাঁশী।

হেমাঙ্গিনী বলে—রোজ এত দেরী হয়?

মৃদু হাস্যে নারাণ জবাব দেয়—থিয়েটারের চাকরি কি না! যেদিন প্লে থাকে না, সেদিন থাকে রিহার্শাল।

হেমাঙ্গিনীর ও-পাশের ঘরেও নতুন ভাড়াটে এলো। এক সৌখীন ভদ্রলোক। তাঁর বয়স চল্লিশ পার হয়েছে। তবু সেই-চল্লিশকে প্রাণপণে তিনি আঁকড়ে ধরে আছেন! বহু পরিশ্রম করে মাথার চুলে কলপ দেন, সিঁথিতে টেরির তরঙ্গ তোলেন।

হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে চোখোচোখি হলে ভদ্রলোকের চোখে যেন হাসির বিদ্যুৎ খেলে যায়! এ-হাসির অর্থ হেমাঙ্গিনী বোঝে। কিন্তু সে দোলে না, চমকায় না, রাগ করে না। জানে, খরিদদার লক্ষ্মী! ঘরের ভাড়া আর খাই-খরচের দরুণ ভদ্রলোক টাকা দেন পঁচিশটি করে এবং সে-টাকা দেন মাসের পয়লা তারিখে সন্ধ্যাবেলায়। এ নিয়মের ব্যতিক্রম কখনো ঘটে নি। কাজেই তাঁর চোখের ও-চাউনি হেমাঙ্গিনী গায়ে মাখে না।

মাঝে-মাঝে দুজনে কথা হয়। এ-লোকটির কথার পিছনে রোমান্সের নানা ইঙ্গিত থাকে! সে-ইঙ্গিতে অতীত দিনের হাজার স্মৃতির দোল্লায় হেমাঙ্গিনীর মন কেমন দুলে ওঠে!

হেমাঙ্গিনী সরে আসে। কি জানি, এ-লোক যদি প্রশ্রয় পায়

একদিন···তখন অনেক রাত। আষাঢ়ের রাত। খুব খানিকটা ঝড়া-বৃষ্টির পর আকাশে চাঁদ উঠেছে। হেমাঙ্গিনীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। দোতলার সিঁড়ির দোরে কে না ঘা দিচ্ছে? হুঁ!

চাকর দোর খুলে দিলে। হেমাঙ্গিনী বললে—কে রে ভুতো?

ভুতো বললে—নারাণ বাবু।

হেমাঙ্গিনী এলো বাইরে। বললে—এ কি! ভিজে নেয়ে উঠেছেন যে!

মৃদু হেসে নারাণ বললে—হ্যাঁ। রিক্‌শ আর চললো না। পথে এক-কোমর জল। ও-জলে ট্যাক্‌সি চলে না। এক-হাঁটু জল ভেঙ্গে আসতে হলো···এক-হাতে বাঁশী, আর এক হাতে জুতো।

আহা, বেচারী! হেমাঙ্গিনীর বুকখানা ধ্বক্ করে উঠলো!

মমতা হলো। হেমাঙ্গিনী বললে,—শীগগির ভিজে জামা-কাপড় ছেড়ে আসুন গে। আমি চা তৈরী করে দি।

নারাণ বললে—না, না, এত-রাত্রে আর চায়ের হাঙ্গাম করবেন না।

হেমাঙ্গিনী শুনলো না, বললে—না, হাঙ্গাম আবার কি! ভুতো, ষ্টোভ জেলে দিয়ে তুই যা, শুগে যা। আমি চা তৈরী করছি।

চা তৈরী হলো। এবং হেমাঙ্গিনীর ঘরের সামনে বারান্দায় টুলে বসে নারাণকে চা পান করতে হলো।

আকাশে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা মেঘের বুকের উপর দিয়ে চাঁদ ছুটে চলেছে! কোথায় যেন কি পাবে···কে যেন সেখানে আশা-পথ চেয়ে বসে আছে

চাঁদের জন্য! হেমাঙ্গিনী ঐ চাঁদের পানে চেয়েছিল! চাঁদ জানে বৈ কি, নিশ্চয় জানে, সুরথ কোথায় আছে! আশ্চর্য্য মানুষ কিন্তু এই সুরথ! পনেরো বছরেও মানুষের খেয়াল হলো না· স্ত্রীর কথা, সংসারের কথা?

চা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে মৃদু স্বরে নারাণ বললে—কেন যে আপনি এত যত্ন করেন আমায়!

হেমাঙ্গিনী চমকে উঠলো! যত্ন? হ্যাঁ, তা সে করে বৈ কি! কে জানে, এই আত্মভোলা লোকটিকে হোটেলের আর-সবার চেয়ে কেন তার এত ভালো লাগে! এ-লোকটির উপর কেন তার এমন মায়া…

হেমাঙ্গিনীর মুখে কথা ফুটলো না।

নারাণ বললে—আমার বড় ভালো লাগে! মনে হয়, আর-জন্মে আপনি আমার কেউ ছিলেন…খুব আপনার জন!

হেমাঙ্গিনীর বুকের মধ্যে অশ্রুর বাষ্প পুঞ্জিত হয়ে আছে। হেমাঙ্গিনী সতর্ক থাকে! সে বাষ্প-পুঞ্জে এতটুকু ঘা না লাগে! লাগলে অজস্রধারে যে-বর্ষণ হবে, সারা পৃথিবী বুঝি তাতে ভেসে যাবে!

নারাণের কথায় সে বাষ্পপুঞ্জ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে আজ ফেটে পড়বার জো!

তাড়াতাড়ি হেমাঙ্গিনী বললে—সত্যি আপনার কেউ কোথাও নেই?

মলিন হাস্যে নারাণ বললে—দুনিয়ায় আমার কেউ নেই, কিছু নেই…শুধু এই বাঁশী আমার সম্বল! তাও বরাবরের সাথী নয়।…শুনি, মাথায় ভারী চোট্ লেগে অজ্ঞান হয়ে আমি পড়ে ছিলুম ইডেন-গার্ডেনের ওদিকে গঙ্গার ধারের পথে। সে-অবস্থা দেখে লোকজন আম্বুলেন্স ডেকে আমায় তুলে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। হাসপাতালে

থেকে সেরে উঠলুম। কিন্তু সব ভুলে গেলুম। মাথায় নাকি খুব চোট লেগেছিল। ডাক্তাররা বললেন, কি নাকি concussion of the brain! এ-রকম জখমে মানুষ নাকি আগেকার কথা সব ভুলে যায়! একটি ভদ্রলোকের কাছে বাঁশী শিখলুম। হাসপাতাল থেকে বেরুবার পরে তিনি আশ্রয়ও দিয়েছিলেন। কিন্তু পরের বাড়ীতে জেঁকে বসে থাকতে লজ্জা হলো। চেষ্টা করতে এই বাঁশীর জোরে শেষে থিয়েটারে চাকরি মিললো।...তবে জীবন এমন খালি-খালি মনে হয়!...দু'চার মাসের বেশী কোথাও একটানা থাকতে পারি না। এই বাসাতেই এতদিন যা রয়ে গেছি...বোধ হয়, এ শুধু আপনার দরদ যত্নে!...

লজ্জায় হেমাঙ্গিনীর সারা দেহ-মন ছমছম করতে লাগলো। হেমাঙ্গিনী দরদ করে, সত্য! কি জানি, এ ভদ্রলোকটিকে কেন যে তার এত ভালো লাগে!...

কিন্তু ইনি তা বুঝেছেন? ছি!

কোনোমতে বাষ্পার্দ্র স্বরে হেমাঙ্গিনী বললে—যান, শুতে যান! অনেক রাত হয়েছে।

নারাণ বললে—যাচ্ছি।...কিন্তু একটা কথা আমি প্রায় ভাবি... বুঝলেন,—এই আপনার সম্বন্ধে...

বুকখানা দুলে উঠলো! হেমাঙ্গিনী বললে—কি ভাবেন?

নারাণ বললে—এতদিন এখানে আছি...আপনার স্বামীকে তো কখনো দেখলুম না!

—না...তিনি বিদেশে আছেন।

হেমাঙ্গিনীর স্বর গাঢ়।

নারাণ বললে—ও!

তারপর নারাণ গেল নিজের ঘরে।

হেমাঙ্গিনী চুপ করে বসে রইলো। আকাশের বুকে চাঁদের ছোটার এখনো বিরাম নেই! আকাশের চাঁদ কার সন্ধানে চলেছে? সুরথের? হেমাঙ্গিনীর নিশ্বাস বাতাসে মিশে গেল।

দুদিন পরের কথা। দুপুর-বেলায় ও-ধারের ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা।

ভদ্রলোক আজ অফিসে যান নি।

ঘরের মেঝেয় শুয়ে হেমাঙ্গিনী একখানা বাংলা বই খুলেছে, দোরের কাছে এসে সে ভদ্রলোক ডাকলেন,—হেমাঙ্গিনী…

হেমাঙ্গিনী চমকে উঠলো। এ স্বর যেন চেনা!

হেমাঙ্গিনী এলো ঘরের বাইরে। ও-ঘরের ভাড়াটে ভদ্রলোকটি। কিন্তু তাঁর দু'চোখে কি তীব্র ক্ষুধা!

ভদ্রলোকটি বললে—আমাকে তুমি চিনতে পারলে না কোনোদিন? আশ্চর্য্য!

ভদ্রলোকের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে বিস্ময়-ভরা স্বরে হেমাঙ্গিনী বললে—না।…কে আপনি?

ভদ্রলোক বললেন—পনেরো বছর আগে…মনে পড়ে? তোমায় আমি কি ভালো বাসি!…পনেরো বছরে তোমাকে ভুলতে পারিনি হেম…অথচ ভয়ে তোমার কাছে পরিচয় দিতেও পারছিনে!…পনেরো বছর পরে আজ আমি ক্ষমা চাইছি…পারবে আমায় ক্ষমা করতে?

ক্ষমা !···কে এ ?

হেমাঙ্গিনীর বুকে সঘন স্পন্দন ! তার···

না, না···

ভদ্রলোক বললেন—যদি অপরাধ করে থাকি, তোমাকে অত্যন্ত বেশী ভালোবাসি বলেই সে-অপরাধ···

আকাশে আবার মেঘ জমছিল। ও-পাশের ঘরে বাঁশী বাজে···করুণ সুর !

হেমাঙ্গিনী বললে—অপরাধ ! কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে···

ভদ্রলোক বললেন—পারছো না ? বেশ, তোমায় কোনো কথা লুকাবো না।···পনেরো বছর আগে···মনে পড়ে রাত্রে সেই আমি পথে বেরিয়ে পড়লুম ? দিক্-বিদিকের জ্ঞান ছিল না। শুধু চলেছি··· চলেছি···চলেছি !···রাত তখন তিনটে···ইডেন-গার্ডেন পেরিয়ে ষ্ট্রাণ্ডে দুজনে দেখা। সামনা-সামনি ! সুরথ আর আমি !···রাগে জ্বলে উঠলুম ! আমার পাছু নিয়েছে ? বটে ! আমার হাতে ছিল লাঠি। দিলুম তার মাথায় বসিয়ে ! সুরথ মাটিতে মুখ গুঁজড়ে সুরথ পড়ে গেল।···আমি সরে পড়লুম। সকালের দিকে আম্বুলান্স ডাকিয়ে লোকজন তাকে পাঠালো হাসপাতালে···ভিড়ে দাঁড়িয়ে স্বচক্ষে আমি তা দেখেছি। তার পর গা-ঢাকা দিয়ে রইলুম প্রায় দু'বছর···

হেমাঙ্গিনীর গায়ের রক্তে যেন আগুন জ্বলে উঠলো। কম্পিত স্খলিত কণ্ঠে হেমাঙ্গিনী বললে—কে তুমি ?

ভদ্রলোক বললেন—আমি তোমার সেই অক্ষয় ! তোমার প্রেমে পাগল অক্ষয় ! আমায় ক্ষমা করো, হেম ! তোমার কেউ নেই···আমারও কেউ নেই !

বর্ষার মেঘ অজস্র-ধারায় ঝরে পড়ছে। ও-ঘরে বাঁশী তার করুণ স্থর মিশিয়ে দেছে ঘনঘোর বর্ষার স্থরে···

পাগলের মতো হেমাঙ্গিনী ছুটলো ও-ঘরে—ওগো···ওগো···

হেমাঙ্গিনীর সে বিবশ-মূর্ত্তি দেখে নারাণ চমকে উঠলো! সে বাঁশী রেখে দিলে।

হেমাঙ্গিনী থাকতে পারলো না, উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে—তুমি আমাকে চেনো না! কিন্তু আমি তোমাকে চিনেছি! তুমি নারাণ বাবু নও···নারাণ বাবু নও! তুমি···তুমি···তুমি আমার সর্ব্বস্ব!

নারাণের বুকের উপর হেমাঙ্গিনী একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লো।···

এই পর্য্যন্ত বলে গোকুল চুপ্ করলো।

আমার যেন চেতনা নেই!···এ সত্য?

গোকুল বললে—এ নিয়ে চমৎকার একটা গল্প লেখা যায় না?

আমি জবাব দিলুম না। কি জবাব দেবো?

একদা

বিনয়ভূষণ মস্ত লেখক। কথা-সাহিত্যে তার আজ অসাধারণ খ্যাতি। পূজার সময় বিনয়ভূষণ ছুটিল কাশী…তীর্থ করিবার অভিপ্রায়ে নয়; পশ্চিমের আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচয় করিতে।

কোদাইচৌকির কাছে এক ভদ্র গৃহের দোতলায় কামরা ভাড়া লইয়া সেইখানে আস্তানা পাতিল। বাড়ীর মালিক বিমলা দেবী। বিধবা। বয়স হইয়াছে। চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে। বড় ছেলে হিন্দু-ইউনিভার্সিটিতে চাকরি করে।

•
•
•

সেদিন সকাল হইতে বর্ষা নামিয়াছে। বিনয়ভূষণ তক্তাপোষের উপরে একরাশ বই জড়ো করিয়া পাতায়-পাতায় চোখ বুলাইতেছে, এমন সময় বিমলা দেবী সে ঘরে প্রবেশ করিলেন।

বইয়ের পাতায় বিনয়ভূষণকে নিমগ্ন দেখিয়া বিমলা দেবী বলিলেন,—নতুন বই লেখবার আয়োজন করছো বুঝি, বাবা?

বিনয়ভূষণ সস্মিত দৃষ্টিতে তাঁর পানে চাহিল।

বিমলা দেবী বলিলেন,—ছেলেদের কাছে শুনলুম, তুমি মস্ত লিখিয়ে। অনেক গল্প-উপন্যাস লিখেছো। আমি অবশ্য পড়িনি। এখন আর পড়ার অভ্যাস নেই! এককালে খুব পড়তুম। হরিদাসের গুপ্তকথা, দেবীচৌধুরাণী, কমলকুমারী, ললিত-সৌদামিনী বই পড়েছি। সেকালে যা বেরুতো! একালে সাত-আট বছর আর কোনো বই

ছুঁইনি। পাইনা বটে, তাছাড়া নানান্ দুঃখে-কষ্টে বই খুলতে মন লাগে না!

কখানা ইতিহাসের পাতা খুলিয়া বিনয়ভূষণ রসদ সংগ্রহ করিতেছিল, এবার একখানা ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিবে ঠিক করিয়াছে, সেই জন্য।

বিনয়ভূষণ কোনো জবাব দিল না। স্মিথের ইতিহাস ঠেলিয়া এসিয়াটিক সোসাইটীর জার্ণালখানা টানিয়া তার পাতা খুলিল।

বিমলা দেবী বলিলেন—এই সব বই দেখে দেখে বুঝি বই লেখো? তাই দেখি, তোমাদের লেখা বই সব একই রকম হয়। একটু-আধটু তফাৎ থাকে না, তা নয়! থাকলেও সবার ধাঁচ কিন্তু ঐ একই রকম!

এ কথাটি কথা-শিল্পীর গর্ব্ব-গৌরবে অনেকখানি খোঁচা দিল।

বিনয়ভূষণ কহিল—বই দেখে আমি বই লিখি না।

—তবে ও কি দেখচো? এত বই এনেছো সঙ্গে···

বিনয়ভূষণ কহিল—ওগুলো হচ্ছে ইতিহাস। অর্থাৎ বুদ্ধদেবের নাম জানেন তো?

বিমলা দেবী বলিলেন—হ্যাঁ।

বিনয়ভূষণ বলিল—সেই বুদ্ধদেব কোথায়-কোথায় গিয়েছিলেন, কোন্ রাজার সভায় কি-শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাঁর শিষ্যত্ব স্বীকার করে কোথায় কোন্ রাজা প্রজাদের কি মঙ্গল সাধন করেছিলেন, সেই সব খপর সংগ্রহ করছি। ঐ সব খপরের উপর আমার লেখার কাঠামো খাড়া করবো···

বিমলা দেবী বলিলেন—ও···আমি ভাবতুম তোমরা যে-সব গল্প-উপন্যাস লেখো, তা আর পাঁচজনের লেখা বই পড়ে সেই সব গল্প দেখে তারি ধাঁচে!

বিনয়ভূষণের বিরক্তি ধরিল। আকার-ইঙ্গিতে এ যে চুরির অপবাদ দেওয়া! বিনয়ভূষণ বলিল—আমি কখ্খনো আর-কারো লেখা গল্প-উপন্যাস দেখে কোনো গল্প-উপন্যাস লিখিনি!

তার স্বরে একটু ঝাঁজ!

বিমলা দেবী কহিলেন—বটে! তা হতে পারে। কিন্তু আমি পড়েছি কি না এককালে এমনি দশখানা বই। ঐ বঙ্কিমবাবু ছিলেন না···যিনি কপালকুণ্ডলা লিখে গেছেন···তাঁর ঐ কৃষ্ণকান্তর উইলে তিনি লিখে গেছেন গোবিন্দলাল তার স্ত্রী ভ্রমরকে ছেড়ে রোহিণীকে নিয়ে দেশ-ছাড়া হলো, তার পর সেই রোহিণীর ব্যবহারে রাগে তাকেই গুলি করে মেরে ফেললে। ঠিক এমনি ধারাই পড়েছি আর একটী গল্পে। সে গল্পের নাম কমলকুমারী। তাতেও ঐ কমলকুমারীর স্বামী বীরেশ্বর স্ত্রীকে ছেড়ে বিদ্যুৎবালাকে নিয়ে চলে গেল···আর বিদ্যুৎবালার ব্যবহারে রেগে ঐ বিদ্যুৎবালাকে বীরেশ্বরই শেষে মেরে ফেললে। তবে বিদ্যুৎবালাকে বীরেশ্বর গুলি করে মারেনি, সে মেরেছিল বিষ খাইয়ে!

বিনয়ভূষণের ভালো লাগিল না! বলিল—আপনার কোনো কথা আছে আমার সঙ্গে?

বিমলা দেবী বলিলেন—আছে বৈ কি, বাবা। বৃষ্টি হচ্ছে, তাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, যদি খিচুড়ী তৈরী করি?

নিষ্কৃতি পাইবার আশায় বিনয়ভূষণ বলিল,—খুব ভালো হবে। খিচুড়ী···চমৎকার ব্যবস্থা! কথাটা বলিয়া বিনয়ভূষণ জার্ণালের পাতা খুলিল।

বিমলা দেবী দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন—তোমরা যে-সব গল্প লেখো, সে-সব লেখার খানিকটা সত্যির সঙ্গে বেশ মেলে

…শেষটায় কিন্তু মেলে না। তাই কত দিন আমার মনে হয়েছে, তোমাদের কারো দেখা পেলে জিজ্ঞাসা করবো, সবটা কেন সত্যির সঙ্গে মিলিয়ে লেখো না ?

বিনয়ভূষণ বলিল—তার মানে ?

বিমলা দেবী বলিলেন—মানে, গোড়ার দিকটা খুব চমৎকার মেলে আমাদের সত্যিকারের ঘর-সংসারের সঙ্গে, তার পর খেই হারিয়ে ফেলে জোড়াতালি দিয়ে তোমরা বই শেষ করো। শেষের দিকটা পড়তে ভালো লাগে, কিন্তু সে-শেষের সঙ্গে সত্যিকারের জীবন মোটে মেলে না ?…এ পথে দেখলুম তো অনেক-কিছু !

বিমলা দেবী নিশ্বাস ফেলিলেন। বেদনার সুগভীর নিশ্বাস !

বিনয়ভূষণ একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল বিমলা দেবীর পানে।

বিমলা দেবী বলিলেন—সেই জন্য তোমাদের লেখা গল্প চিরদিন আমাদের কাছে গল্প থেকে যায়। সেকালে লোকে লিখতো রাজ-রাজড়ার গল্প, রূপ-কথা। সে-সব গল্পে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, দেবতা-দৈত্য মানুষের জীবনকে কি রকম উল্টে-পাল্টে দিত। সে গল্প পড়ে আমরা কখনো ভয় পেতুম, কখনো খুশী হতুম। তা থেকে কোনো আশা বা সান্ত্বনা পেতুম না। একালে তোমাদের লেখা পড়েও তেমনি কখনো খুশী হই…কখনো ব্যথা পাই ! সে-গল্পের সঙ্গে নিজেদের প্রাণের যোগ পাইনা বলে গল্প শুধু গল্প থেকে যায়—আমাদের মনে নিত্য-দিনের খোরাক জোগাতে পারে না !

কথাগুলা বিনয়ভূষণের মন্দ লাগিল না। এমন করিয়া গল্প-উপন্যাস বিশ্লেষণ…সে-বিশ্লেষণের কথা এমন সহজ ভাবে বলিয়া বুঝাইতে পারেন…বাঃ ! বিনয়ভূষণ এমন কখনো কল্পনা করে নাই !

বিনয়ভূষণ বলিল—আমি কিন্তু যে-সব গল্প লিখি, তা সত্যিকারের

জীবনে যা দেখি-শুনি, তারি উপর নির্ভর করে লিখি,—নিছক মিথ্যা লিখি না! সে-রকম লেখা লেখবার প্রবৃত্তি আমার কোনোকালে নেই!

বিমলা দেবী বলিলেন—জানি না বাবা, তুমি কি লেখো! তবে যত লেখা পড়েচি, দেখেচি তো, বইয়ের শেষের দিকটা যেন কেমন-ধারা! আমাদের সত্যিকার জীবনে তেমন কখনো ঘটতে দেখিনি! না নিজের, না আর-কারো! তাই আমার মনে হয়, তোমরা যা লেখো, তা ঐ এ-বই দেখে ও-বই মিলিয়ে! সে লেখায় যেমন নতুন কিছু দেখি না, তেমনি বইয়ের সংসারের সঙ্গে বা মানুষ-জনের সঙ্গে আমাদের ঘর-সংসারেরো কিছু মেলে না।

বিনয়ভূষণ বলিল—আপনি ভুল করছেন। যে-লোক সত্যি লিখতে জানে, সে এই সত্যিকারের জীবনের যে কোনো খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে এমন লেখা লেখে, সে-লেখা যেন সত্যিকারের জীবনের …কি বলবো? ফটোগ্রাফ!…আমার লেখা গল্প-উপন্যাস এখানে আমি সঙ্গে আনিনি, তবে যদি বলেন, আনিয়ে দেবো। আপনি পড়বেন। পড়লে বুঝবেন, আমি যা-কিছু লিখেছি, তা এই সত্যিকারের জীবনের কথা! সত্যিকারের সংসারের, সত্যিকারের মানুষ-জনের সুখ-দুঃখের কথা। পড়ে দেখবেন, খুব সামান্য ঘটনা নিয়েই আমি গল্প-উপন্যাস লিখেছি!

বিমলা দেবীর মুখে-চোখে সস্মিত ভাব ফুটিল। তিনি বলিলেন—দিয়ো আনিয়ে। পড়বো বৈ কি, নিশ্চয় পড়বো।…

তার পর চুপ করিয়া তিনি কি ভাবিতে লাগিলেন। বিনয়ভূষণ লক্ষ্য করিল। লক্ষ্য করিয়া কহিল—কি ভাবছেন?

বিমলা দেবী বলিলেন—ভাবছি আমার নিজের কথা। আমার

নিজের জীবনে যা-যা হয়েছে, চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছি! কিছুই ভুলিনি! একটার পর আর একটা ঘটনা···ঘটনা খুবই সামান্য হয়তো···কিন্তু তাতে কি না হয়ে গেছে! একটা সংসার আর ক'টা জীবন তিলে-তিলে পুড়ে একেবারে শ্মশান হয়ে গেছে, বাবা! পারো তা নিয়ে তোমাদের গল্প-উপন্যাস লিখতে? তা হলে তোমায় বলি···

রক্তের গন্ধ পাইলে বাঘের যেমন নেশা লাগে, বিমলা দেবীর কথায় বিনয়ভূষণের তেমনি নেশা লাগিল! এই নিঃসঙ্গচারিণী দুঃখিনী বিধবা নারী···তাঁর এই সংসার-চালনার অন্তরালে নাটকের অভিনয় চলিয়াছিল···কত হাসি, কত গল্প, কত ঝড়-ঝঞ্ঝা···সে-রহস্য যদি জানিতে পারে···

বিনয়ভূষণ বলিল—বলবেন? বেশ তো, নিশ্চয় তা হলে তা থেকে আমি উপন্যাস লিখবো। এমন উপন্যাস যে আপনি তা পড়ে একেবারে চমকে উঠবেন!

বিমলা দেবী কহিলেন—এমন-কিছু মস্ত কাহিনী সে নয়, বাবা। সে কাহিনীতে ছোরাছুরি চলেনি, ঘর-ভাঙ্গার ষড়যন্ত্রও জাগেনি! তোমাদের বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের মতো এর মধ্যে রোহিণী-গোবিন্দলাল নেই, দেবী চৌধুরাণী নেই, প্রতাপ-শৈবলিনীও নেই!

বিনয়ভূষণ কহিল—নাই থাকলো প্রতাপ-শৈবলিনী বা গিরিজায়া-মৃণালিনী! ওরা কজন বা! ওরা ছাড়া পৃথিবীতে অনেক বেশী লোক বাস করে, তারা নীরবে যে দুঃখ-যাতনা পায়, সে দুঃখ-যাতনা ভ্রমর-শৈবলিনী কিম্বা কুন্দনন্দিনীর দুঃখ-যাতনার চেয়ে কম নয়। আপনি বলুন আপনার কথা···

বিমলা দেবী বলিলেন—পুরাকালের কথা বলবার দরকার নেই···

আমি বলছি এঁরি জীবনের শেষদিককার কথা···আমার স্বামীর! তিনটি ছেলেমেয়ে। সব-কটিই তখন ছোট। আমরা কলকাতায় থাকতুম। ইনি একটা আপিসে কাজ করতেন। কি দুঃসময় যে এলো,—ট্রাম থেকে পড়ে উনি হাত ভাঙ্গলেন। ডান হাত। পুরুষ-মানুষের যা-কিছু শক্তি বলো, সহায় বলো, ভরসা বলো, সব ঐ ডান হাত···বিশেষ আমাদের গেরস্থর সংসারে!

কথার পিছনে যেন অশ্রুর পাথার! বিনয়ভূষণ স্তম্ভিত দৃষ্টিতে বিমলা দেবীর পানে চাহিয়া রহিল।

বিমলা দেবী বলিলেন—চাকরি গেল। ডান হাতের কাজ! সে ডান হাত যদি যায়, তা হলে চাকরিতে মানুষ রাখবে কেন?

বিনয়ভূষণ কহিল—কতকাল সে অফিসে কাজ করেছিলেন?

বিমলা দেবী বলিলেন—প্রায় পনেরো বছর। ঝড়ে-জলে, দুঃখে-শোকে, অসুখে-বিসুখে একটি দিন কামাই করেন নি। চাকরি ছিল সবার আগে।

—মনিব বিবেচনা করলে না?

বিমলা দেবী কহিলেন—চাকরি ছাড়িয়ে দেবার সময় মাসের শেষে যে পনেরো দিন হাতের জন্য হাসপাতালে ছিলেন, সে কদিনের মাইনে কেটে ন্যানি—এইটুকু দয়া করে ছিলেন।

মস্ত একটা নিশ্বাস বিমলা দেবীর বুকের হাড়-পাঁজরা ঠেলিয়া বাহির হইল।

বিনয়ভূষণ কহিলেন—তার পর?

বিমলা দেবী বলিলেন—হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে বাড়ী এলেন; এসেই অফিসে ছুটলেন। বিকেলে ফিরলেন। পাগলের বেশ! মাথার চুলগুলো উস্কোখুস্কো···দু'চোখ জবাফুলের মতো রাঙা···মুখে কথা

নেই! আমি বললুম—কি হলো গা? বললেন—ঘরে বাস করা··· তা'ও ভগবানের সইলো না! পথে বার করে দিলেন তিনি! বলে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলেন। তাঁকে থামাবো কি, ছেলে-মেয়েগুলোও সেই সঙ্গে যে কান্না তুললো···সেদিনের কথা আজো ভুলিনি!···

বিমলা দেবী চুপ করিলেন।

বাহিরে কোন্ দোকানে কারিগর লোহা পিটিতেছিল···একঘেয়ে বিশ্রী কর্কশ শব্দ যেন কানে তালা লাগাইয়া দিবে!

চুপ করিয়া থাকিবার পর বিমলা দেবী আবার বলিলেন—বললুম, কেন কাঁদো? যিনি জীব দিয়েছেন, তিনিই ব্যবস্থা করবেন! তাতে জবাব দিলেন—কোথা থেকে কি দিয়ে ব্যবস্থা করবেন? যার হাত যায়, ভিক্ষা ছাড়া সংস্থানের তার আর অন্য কি উপায় আছে, বলো? বোঝালুম, আমার হাতে কিছু পুঁজি আছে, দুচারখানা গহনাও আছে, ভয় করো না। তার পর ভেবে একটা-কিছু উপায় করো। বললেন—কি উপায় করবো? বললুম, ভেবে-চিন্তে বলবো'খন। এখন তুমি মাথা ঠাণ্ডা করো দিকিনি। তুমি যদি এত উতলা হও, তা হলে আমি কি করে নিশ্চিন্ত হয়ে উপায় চিন্তা করবো বলো তো? এমনি করে দু'চার কথা বলতে তিনি স্থির হলেন।

বিমলা দেবী আবার চুপ করিলেন—যেন স্মৃতির ভাণ্ডার খুঁজিয়া দেখিতেছেন! তার পরের-পর ঘটনাগুলি···যে-ঘটনা তখনকার দিনের সঙ্গে এখনকার দিনগুলিকে বাঁধিয়া শৃঙ্খল রচিয়া রাখিয়াছে!

বিনয়ভূষণ কহিল—তার পর?

বিমলা দেবী কহিলেন—দিন তার পর কাটতে লাগলো। হাতের পুঁজি গেল ফুরিয়ে! গহনা যা দুচারখানা ছিল, তাও গেল স্যাকরা-বাড়ী! ছেলেদুটির লেখাপড়া, তাদের অসুখে চিকিৎসা…বাড়ীখানি ক্রমে বাঁধা পড়লো। তারি কিছু টাকা নিয়ে ছোট একটি দোকান খুললেন। কাগজ, পেন্সিল, মার্ব্বেল, লজেঞ্চেশ,—সামান্য পুঁজিতে যা হয়, তাই আর কি! বাড়ীর নীচের তলায় থেকে উপর-তলাটা ভাড়া দিলুম।… ভগবান যাদের উপর বিরূপ, তাদের কোনো চেষ্টা কি সফল হয়? দু'চারজন ভাড়া না দিয়ে পালালো। নালিশ করে ভাড়া আদায় করবো, তেমন সঙ্গতি বা শক্তি ছিল না। বন্ধকী-দেনা সুদে বাড়তে লাগলো। শেষে দু'চার বছরে এমন হলো, সর্ব্বস্ব যায়! আত্মীয়-বন্ধু ছিলেন…তাঁরা জানতেন। কেঁদে তাঁদের দোরে গিয়ে হাত পাতলে হয়তো দু'চার মুঠো ভাতও দিতেন! কিন্তু মুখ ফুটে এ দুঃখের কথা বলতে পারা কত শক্ত, প্রতিদিনের অত দুঃখ-কষ্টে তা বুঝেছিলুম। পরের দোরে যেতে পারিনি। কারো কাছে মুখ তুলে দুঃখের কথা জানাতে পারিনি! শেষে বন্ধকী-দায়ে বাড়ী গেল বিক্রী হয়ে। তখন একটা বস্তীতে গিয়ে আশ্রয় নিতে হলো। কোনো রকমে দিন চললো। ছেলে-দুটি স্কুলে যায়…উনি দোকান চালান। ভাবলুম, বেশী প্রত্যাশা করি না, এমনি ভাবেই দিনগুলো যদি শুধু কেটে যায়! তার পর ছেলেরা ডাগর হবে, মোট বয়েও দু'পয়সা আনবে তো!…ঐ ছেলেরা যখন জন্মায়, মনে আছে বাবা, দুজনে বসে কত কি স্বপ্ন গড়তুম! উনি বলতেন, একজনকে ডাক্তার করবো, আর-একজন হবে উকিল… তখন আমাদের ভাগ্য যাবে ফিরে!

বিমলা দেবীর দু চোখে বাষ্প-সজলতা…স্বর অশ্রু-রুদ্ধ!

বিনয়ভূষণের মুখে কথা নাই। শুধু ভাবিতেছিল, মানুষের জীবন

…জীবনের সুখ-দুঃখ ! বিনয় এত গর্ব্ব করে, যা-কিছু লেখে, তা কল্পনার স্বর্গ-নরক নয়, সত্য জীবনের বনিয়াদের উপরে সে-সব গল্প-উপন্যাসের সৃষ্টি ! কিন্তু এমন দুঃখ-কষ্টের কল্পনাও কখনো করিয়াছে ?

পথে লোহা পেটার কর্কশ রবের উপর একটা দুরন্ত লোকের বজ্রনাদ ধ্বনিয়া উঠিল। বিনয়ভূষণ বিরক্ত হইল। বেদনার করুণ-প্রবাহ…তার তীরে এই বর্ব্বর কোলাহল…অসহ্য !

বিমলা দেবী নিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন—তোমার বিরক্তি হচ্ছে, বাবা ? হবার কথা ! তোমরা জানো, পৃথিবীতে শুধুই সুখ ! তার মধ্যে এ সব দুঃখ-কষ্ট…

বাধা দিয়া বিনয়ভূষণ কহিল,—না, না, কি বলেন আপনি ! আমি মানুষ…মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা শুনে বিরক্ত হবো কেন ?

বিমলা দেবী কহিলেন—তাই ভাবি বাবা, দুটো মিষ্টি কথা শুধু …তাতেও কত বড়-বড় দুঃখ-কষ্ট যে সহ্য করা যায় ! দুর্দ্দিনে দুর্য্যোগে মানুষ সত্যিকারের মানুষ হয়, এ-কথা শুধু বুঝেছি এই দুঃখে পড়ে।… এক-এক সময় খুব অসহ্য মনে হতো। উনি বলতেন, চলো, তোমাদের সকলের হাত ধরে হাবড়ার পুল থেকে মা-গঙ্গার বুকে ঝাঁপ খেয়ে পড়ি।…মনে হতো, ওঁর কথা শুনি ! কিন্তু তখনি চেয়ে দেখতুম,—আমাদের চেয়েও আরো কত-কত দুঃখ-কষ্ট কত লোক পাচ্ছে ! আমাকে তো ভগবান স্বামী-পুত্র-সম্পদ দিয়েছেন,—কেন মরবো ? মরবো না।…তাই মরিনি। মরতে পারিনি !…কিন্তু ও-কথা থাক, তার পরে বলি…

বিনয়ভূষণ কহিল—বলুন…

বিমলা দেবী বলিলেন—শেষে ওঁর অসুখ হলো। খুব শক্ত অসুখ। সে-অসুখে ডাক্তার আর ওষুধের খরচ জোগাতে দোকানখানি গেল উঠে,—বাড়ীর ভাড়া বাকী পড়লো…প্রায় ছ'মাসের ভাড়া চুয়ান্ন টাকা। উনি বলতেন, করচো কি? আমার জন্য টাকা-পয়সা খরচ করো না গো…আমায় যেতে দাও। টাকা-পয়সা থাকলে ছেলেমেয়েগুলোকে রাখতে পারবে, নাহলে ভরা-ডুবি হবে!…চোখের জল চেপে আমি বলতুম, তোমায় যদি রাখতে পারি, তবেই আমার সব থাকবে! নাহলে হোক ভরা-ডুবি, তাতে দুঃখ হবে না!…এমনি করে সাত-আট মাসে কোনোমতে সারিয়ে ওঁকে বাঁচিয়ে তুললুম।…সেরে উঠে দিবা-রাত্রি ওঁর এক কথা, এবার উপায় বলো।…আমি বললুম, আমি উপায় করবো।…উপায় করলুম সত্যি। পাশের দুটি গেরস্থ-বাড়ীতে রান্নার কাজ করতুম।…দু'বেলা। পাঁচ টাকা করে দশ টাকা পেতুম। উনি একটা মাষ্টারী পেলেন। পনেরো টাকা মাইনে…পাঁচটী ছেলেকে দুবেলা পড়ানো…কোনো মতে সংসারের চাকা আবার গড়িয়ে চললো। তার পর একদিন…

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া নটা বাজিল।

বিমলা দেবী যেন চমকিয়া উঠিলেন! বলিলেন,—ছোট্ট করে বলি। বেলা হয়ে গেছে। না হলে তোমার খাবার দেরী হবে।

বিনয়ভূষণ কহিল,—আপনি ব্যস্ত হবেন না। দেরী হলে কোনো ক্ষতি হবে না। আপনি বলুন…

বিমলা দেবী হাসিলেন। মৃদু হাসি। হাসিয়া বলিলেন,—না বাবা, ছোট করেই বলি। কোনো মতে হাতে কিছু সঞ্চয় হলো,—

বাড়ীর একখানা ঘর ছেড়ে দিয়েছি—ভাড়া হয়েছে ছ' টাকা। এমন সময় কোথা থেকে একখানা চিঠি এলো ডাকে…খামে-লেখা চিঠি। উনি বাড়ী এলে ছেলে বললে, এ পরের চিঠি…না দেখে সে খাম ছিঁড়ে চিঠি বার করেছে! খামে নাম ছিল ভূপতিচরণ মল্লিক। আমাদের আগে সে-ঘরে থাকতো ভূপতি মল্লিক। চিঠি এসেছিল তার এক বন্ধুর কাছ থেকে। বন্ধু আর ভূপতি দুজনে রেশ খেলতো। বন্ধু লিখেছিল ভূপতিকে, সামনের রেশে বিশ-পাঁচিশ টাকা দিয়ে অমুক ঘোড়া ধরো। ঘোড়ার নাম দিয়েছিল পেনি। আজো আমার মনে আছে, চিঠিতে লিখেছিল—বিশ-পঁচিশ দিয়ে এ-ঘোড়া ধরলে দু'শো আড়াইশো টাকা পাবে নিশ্চয়। চিঠি পড়ে উনি বললেন, টাকা আছে? এ বিধাতার ইঙ্গিত! নাহলে এ ঘরে বাস করতো ভূপতি মল্লিক, তার ঘরে আমরা আসবো কেন? আর তোমার ছেলেই বা এ খাম ছিঁড়ে এ চিঠি বার করবে কেন!… যা কিছু পুঁজি ঘরে ছিল, কুড়িয়ে-বাড়িয়ে প্রায় ষাট টাকার ওপর হলো। বললেন, এই ষাট টাকায় তোমায় ছশো টাকা এনে দেবো…এ চিঠির লিখন অগ্রাহ্য করা হবে না।

বিমলা দেবী আবার নিশ্বাস ফেলিলেন।

বিনয়ভূষণ কহিল—দিলেন আপনি ষাট টাকা?

বিমলা দেবী বলিলেন—দিলুম বৈ কি!…ছেলে-মেয়েরাও বলতে লাগলো, দাও টাকা!

বিনয়ভূষণ কহিল—তার পর?

বিমলা দেবী বলিলেন—টাকা নিয়ে উনি গড়ের মাঠে গেলেন। …সন্ধ্যা হয়ে গেল, ফেরবার নাম নেই! ভাবনা যা হলো…ওঃ…কি করি? কোথায় যাই? কেমন করে খবর পাই? ভেবে আকুল!

…তার পর রাত তখন নটা…পুলিশ এলো বাড়ীতে। এসে বললে, হাসপাতালে যেতে হবে। সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো…মাথা ঘুরে গেল। …পুলিশের সঙ্গে হাসপাতালে গেলুম। গিয়ে শুনি, রেশে টাকা হেরে মোটরের তলায় পড়েছিলেন।…জ্ঞান ছিল। ঐ একটি কথাই বললেন। বললেন, তোমাদের মুখ থেকে মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে এসে ঘোড়ার পায়ে তা ঢেলে দিয়ে তোমাদের চুর করে দিয়েছি! তার পর প্রলাপ। তাতেও ঐ এক কথা! দারুণ বিকারের ঘোরে তিনি চলে গেলেন।…তার পর কি করে এই কাশীতে এসে মা-অন্নপূর্ণার পায়ে পড়ে আছি…কিন্তু না বাবা, আর তোমায় জ্বালাতন করবো না! যেটুকু বললুম, লিখো। তবে এ-সব কথা কেউ পড়তে চায় না! লেখো বটে তোমরা মানুষের সুখ-দুঃখের কথা…কিন্তু এমন…?

কথার শেষে বিমলা দেবী আবার হাসিলেন। হাসি নয়, সে যেন হাসির আবরণে ঢাকা মস্ত ট্রাজেডি! তেমনি করুণ, তেমনি তীক্ষ্ণ!

বিনয়ভূষণ স্তম্ভিত! মুখে কথা নাই! চোখের দৃষ্টি পলকহীন!

ওদিক হইতে কে ডাকিল,—মা…

বিমলা দেবী কহিলেন—মেয়ে ডাকছে। বোধ হয়, উনুন ধরেছে। আসি বাবা…লিখো এ-কাহিনী…মানুষ পড়ে' আমোদ পাবে না, তবে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে শিখবে।…বুঝবে, পৃথিবীতে কত বড়-বড় দুঃখই যে কত লোককে সইতে হয়!

বিমলা দেবী ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। বিনয়ভূষণ বসিয়া রহিল স্তম্ভিত বিমূঢ়ের মতো!

সাম্য ও স্বাধীনতা

শীতের সন্ধ্যা। রাসবিহারী এভেন্যুতে মস্ত একখানা বাড়ীর সাম্‌নে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে পন্টিয়াক্ গাড়ী। ড্রাইভার বাঙালী···বয়সে তরুণ ···গাড়ী ছাড়িয়া ফুট-পাথে দাঁড়াইয়া বিড়ি টানিতেছে। ওদিক্‌কার ফুট-পাথে দাঁড়াইয়া সুরেশ। বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর গাড়ীর কাছে আসিল; আসিয়া ড্রাইভারকে কহিল,—দেশলাই আছে ভাই?

ড্রাইভার কহিল,—আছে।

পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া ড্রাইভার সুরেশকে দিল। সুরেশ সিগারেট জ্বালিল—ড্রাইভারকেও একটা দিল; দিয়া বলিল,—এটা দ্যাখো তো পরখ করে'। স্বদেশী সিগারেট।···

ড্রাইভার সিগারেট লইল। সুরেশ কহিল,—এই শীতে কষ্ট তোমার কম নয়! বেরুচ্ছো···বাবুরা কত রাত্রে ফিরবেন, কে জানে!

কথাটা বলিয়া দরদের প্রত্যাশায় সুরেশ হাসিল।

ড্রাইভার ছোকরাটি ভালো। একদিন সে সুখের স্বপ্ন দেখিত! কিন্তু ঘটনা-চক্রের আবর্ত্তে পড়িয়া অকূলে ভাসিয়া এ-কাজে কূল লইতে হইয়াছে!

ড্রাইভার কহিল,—মনিব ভালো।

—বটে! এখন কোথায় চলেছ? সিনেমায় নিশ্চয়?

ড্রাইভার কহিল,—না। বরানগরে নেমন্তন্ন আছে।

—বাড়ীশুদ্ধ সকলেই নেমন্তন্ন চলেছেন?

ড্রাইভার কহিল,—না। বড় দিদিমণি শুধু যাবেন না। তাঁর এগজামিন আছে। বাড়ীতে লেখাপড়া করবেন।

—ও!...

সুরেশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বড় বাড়ীটার পানে চাহিয়া রহিল। দু'চোখে দরিদ্র আতুরের সকরুণ দৃষ্টি! এত-বড় প্রাসাদে কেহ পরম সুখে বাস করে—কেহ বা আবার কাঙালের মতো আশ্রয়ের সন্ধানে পথে-পথে ঘুরিয়া বেড়ায়! বিধাতা সকলকেই ধরণীতে পাঠাইয়াছেন—নিজের হাতে গড়িয়া! ধরণীর বুকে পৌঁছিবামাত্র মানুষে-মানুষে কতখানি পার্থক্য দেখা দেয়!·· ভাগ্য!

সুরেশকে ড্রাইভার নিরীক্ষণ করিতেছিল। প্রাণের কোণে একটু মমতা জাগিল। সে বলিল,—চাকরি নেই বুঝি?

ম্লান মৃদু হাস্যে সুরেশ কহিল,—কি করে জান্‌লে?

ড্রাইভার বলিল,—চেহারা দেখলেই বোঝা যায়।

সুরেশ কহিল,—না, চাক্‌রি নেই।

—গাড়ী চালাতে জানো?

—না।

ড্রাইভার কহিল,—জানলে একটা চাকরি হতে পার্‌তো! বোস্ সাহেবের বাড়ী। তিনি বাঙালী ড্রাইভার চান।

দুজনে অনেক কথা হইল। চাকরির টানাটানি পড়িয়াছে। অফিসে-গৃহে সকলেই লোক-জন কমাইয়া দিতেছে, তবু বিলাসে-সখে পয়সা-খরচের অন্ত দেখি না! এই যে ড্রাইভারের মনিব রায় সাহেব···বাড়ীতে লোকজন ছিল অনেক···খানশামা, বেয়ারা, বাবুর্চি, বামুন, দাসী। এখন চারজন আছে—বামুন, ঠাকুর, দাসী আর

একজন বেয়ারা! বলেন, খরচ কমাইতে হইবে। অথচ সিনেমা দেখা আছে নিত্য…তার উপর আজ চলো ব্যারাকপুর পার্ক…কাল ডায়মণ্ড হার্বার…পরশু শিবপুরের বাগান…

সুরেশের বুকের মধ্যে কিসের তরঙ্গ ফুলিয়া ফুঁশিয়া উঠিতেছিল! আশা-নিরাশার তরঙ্গ! কত কল্পনা, কত চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাত …ভয়-সংশয়, বেদনা-হর্ষ…মনের নানা বৃত্তি মিলিয়া যেন একটা ফ্যাক্টরি খুলিয়া দিয়াছে! রায় সাহেবের সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। ড্রাইভার অনেক কথা বলিল। কর্ত্তার মেজাজ, গৃহিণীর স্নেহ, দুটি মেয়ে…তাদের প্রকৃতি…

আলাপ-পরিচয় চলিল বিশ মিনিট। তার পর সুরেশ কহিল, —আসি ভাই। আবার আমি আসবো'খন। একটা চাক্‌রি যদি দেখে দাও তো বড্ড ভালো হয়।

ড্রাইভার কহিল,—দেখবো চেষ্টা…বাঙালীর জন্য বাঙালীর চেষ্টা করা উচিত। যদি ড্রাইভিং শিখতে পারো…

মৃদু হাসিয়া সুরেশ কহিল,—চেষ্টা করবো।

এক-পা এক-পা করিয়া আগাইয়া সুরেশ চলিল পশ্চিম দিকে। গতি মন্থর।

পিপাসায় গলা শুকাইয়া কাঠ! সাম্‌নে কাফে। সুরেশ সেখানে ঢুকিল। প্রচণ্ড ভিড়। জানলার ধারে একটা টেব্‌ল শুধু খালি। সুরেশ আসিয়া বসিল সেইখানে—টেব্‌লের সাম্‌নে। বয়কে বলিল, —এক পেয়ালা চা, দুটো ডিম, আর টোষ্ট…

চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করিয়া খোলা জানলা দিয়া পথের পানে চাহিয়া সে বসিয়া রহিল। অনেক কথা মনে জাগিতেছিল! আশার ফানুশে ভর করিয়া সহর কলিকাতায় আসিয়াছিল…বি-এ ফেল।

আর-একবার চেষ্টা করিবে, সে সঙ্গতি ছিল না। বাড়ীতে অনেকগুলি মুখ তার পানে চাহিয়া আছে···তাদের ক্ষুধা মিটানো চাই। সহরে আসিয়া ঘুরিয়া-ঘুরিয়া কত দিন কাটাইয়া দিয়াছে···মুখের পানে কেহ তাকায় নাই। দুর্দ্দশার চরম! আক্রোশে মন তাতিয়া উঠিল! যদি পারিত উল্কার মতো এই বিলাস-ঐশ্বর্য্যকে জ্বালাইয়া ছাই করিয়া দিতে···

এমন সময় আশ্রয় মিলিল। সেই সঙ্গে পয়সাও!

যে করিয়া···মাঝে মাঝে গ্লানির ভারে মন নুইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে! কিন্তু উপায় নাই। বাঁচিতে হইবে তো! বাঁচা—চাই—যেমন করিয়া হোক্, সে বাঁচিতে চায়!

সহসা মিষ্ট কণ্ঠের একটি স্বর···সুরেশের চেতনা জাগিল। সুরেশ চাহিয়া দেখে, একটি তরুণী। তার দুই চোখে যেন অগ্নি-শিখা! তরুণী বলিল,—এ চেয়ার খালি আছে?

সুরেশ কহিল,—আছে।

তরুণীর হাতে ছিল ছোট ভ্যানিটি-ব্যাগ। টেব্‌লের উপরে সেটা রাখিয়া তরুণী চেয়ারে বসিয়া ডাকিল,—বয়···

বয় আসিল। তরুণী কহিল,—এক পেয়ালা চা আর কেক্। প্যাষ্ট্রী পাবো?

—পাবেন।

—আচ্ছা···চারখানা প্যাষ্ট্রী ঐ সঙ্গে।

আপন-মনেই তরুণী বলিল,—মোটর নিয়ে এমন বিভ্রাট ঘটবে, কে জানে! ঐ মোড়ে ব্রেক-ডাউন। বিশ মিনিট ধরে ড্রাইভার চেষ্টা করলে, গাড়ী নড়ে না! গাড়ীর চার ধারে ভিড় জমে গেল···যেন রাস, না, দোল দেখতে এসেছে!···একটা লোক হাত দিয়ে সাহায্য

করবে—তা নয়! দাঁড়িয়ে মজা দেখচে! cowards! বিরক্তি ধরে গেল···টেলিফোন করে দিলুম অটোমোবাইল-এসোসিয়েশনে। বোধ হয়, কার্বুরেটেরে ময়লা জমেছে! ড্রাইভারগুলোও তেমনি পাজী হয়েছে। দেখে না, গাড়ীর যত্ন নেয় না···মাহিনার জন্য শুধু হাত পেতে আছে। আজই ছাড়িয়ে দেবো!···আছে আপনার জানা ভালো ড্রাইভার?

সুরেশ কহিল,—না।

সে অবাক্! জানা নাই, শুনা নাই, গায়ে পড়িয়া তার সঙ্গে সহজ সুরে এত কথা! সুরেশের বিস্ময়-শ্রদ্ধার সীমা রহিল না। বাঙালীর ঘরের মেয়ে! কথায়-হাবে-ভাবে কোথাও এতটুকু দ্বিধা নাই, কুণ্ঠা নাই! কি সহজ সরল ভঙ্গী! সাম্য-স্বাধীনতার অমৃত-ফল! চমৎকার!

চা আসিল। তরুণী পেয়ালায় মনোনিবেশ করিল। সুরেশ বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তার পানে চাহিয়া রহিল। মাঝে মাঝে কে যেন মনকে চাবুক মারিতেছিল···এ ভাবে চাহিয়া থাকা অন্যায়! কিন্তু চোখের দৃষ্টি ফিরাইয়া লইবে, সুরেশের সে-সাধ্য ছিল না।

সে যেন কোন্ মায়া-রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে! এমন তরুণীর এত কাছে কখনো আসন পায় নাই! পাইবার কল্পনাও কোনো দিন মনের কোণে উদয় হয় নাই!

সহসা মুখ তুলিয়া তরুণী চাহিল সুরেশের পানে। কহিল,—আপনাকে এখনো চা দিলে না?

সুরেশ কহিল,—আমার চা খাওয়া হয়ে গেছে।

—ও!··আপনি বুঝি এই লেকের দিকেই থাকেন?

সুরেশ কহিল,—না।

সুরেশ কুণ্ঠা বোধ করিতেছিল। মনে হইল, তার বেশভূষা আর ভদ্র চেহারা দেখিয়া তরুণী এমন সহজ আলাপে তাকে কৃতার্থ করিতেছে! তরুণী যদি জানিত, কি করিয়া সে দিন কাটায়···

তরুণীর দু'চোখের দৃষ্টি যে-রকম তীক্ষ্ণ···হয়তো ও-দৃষ্টির সাম্‌নে তার সত্যকার পরিচয় ধরা পড়িতে বিলম্ব ঘটিবে না! কিন্তু···

তা কি সম্ভব? আলোর রাজ্যে চিরদিন যে বাস করে বিচরণ করে, অন্ধকার কি বস্তু, সে-ধারণাও হয়তো তার মনে স্থান পায় না! মনকে সুরেশ প্রাণপণে রুখিতেছিল···ভয় নাই! যেটুকু আলো পাও, নিজেকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়ো না!

তরুণী কহিল,—আপনি কোথায় থাকেন?

—শ্যামবাজার।

—এখানে কোনো কাজে এসেছিলেন বুঝি?

উদ্যত নিশ্বাস রোধ করিয়া সুরেশ কহিল, তাই।

সুরেশের মুখ বিষণ্ণ মলিন। তরুণী তাহা লক্ষ্য করিল, করিয়া কহিল,—আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, কোনো রকম দুশ্চিন্তা···চাকরির চেষ্টা নিশ্চয়!

জমাট মেঘে বাতাসের আঘাত লাগিলে যেমন মেঘ ফাঁশিয়া বৃষ্টিধারা ঝরিয়া পড়ে, গ্লানির জমাট স্তূপে এই করুণার স্পর্শ লাগিবা-মাত্র সুরেশের প্রাণের ব্যথা মুখের ভাষায় ঝরিয়া পড়িল!

সুরেশ বলিল,—চাকরি আছে···কিন্তু সে-চাকরির গ্লানিতে মনে এতটুকু স্বস্তি নেই! এ চাকরি ছেড়ে দেবো, ভাবছি···

তরুণীর দুই চোখে সহানুভূতির ছায়া পড়িল। তরুণী কহিল, —চাকরির যে-রকম দুর্গতি···ফশ্‌ করে ছেড়ে দেবেন?

—উপায় নেই। এ চাকরিতে পলে-পলে কি অসহ্য ব্যথা···

—কি এমন চাক্‌রি…?

সুরেশ বলিল,—বড় নোংরা কাজ। আপনি বুঝবেন না! দায়ে পড়ে এ চাকুরি নিতে হয়েছে! জীবনে ক্রমে এমন জোট পড়ছে, নিশ্বাস বন্ধ হবার জো!

তরুণী কহিল,—সংসারে অভাব দেখা দিলে…

—তাই। পাড়াগাঁয়ের সংসার। সে সংসার আমার উপর নির্ভর করছে। নানা জায়গায় নিরাশ নিরুপায় হয়ে শেষে এই চাক্‌রি নিতে হয়েছে…

তরুণী কোনো কথা বলিল না। দু'চোখের প্রশান্ত গভীর দৃষ্টি সুরেশের মুখে নিবদ্ধ করিয়া সুরেশের পানে চাহিয়া রহিল।

সুরেশের মনের প্রান্তে বসিয়া বার-বার কে তাকে ডাকিয়া বলিতেছিল, হয়তো তোর মুক্তির উপায় মিলিয়াছে! নহিলে এ বয়সের মেয়ে…বড় ঘরের মেয়ে…তোর সঙ্গে এমন সহজ-আলাপ করিতে কেন সে আসিবে? খুলিয়া বল্‌ তোর দুঃখের কথা…হয়তো একটা উপায় করিয়া দিবে!

সুরেশ কহিল,—কাজের ভার নিয়েছি…আজ রাত্রেই এ ভার নামিয়ে সরে পড়বো! না হয় মোট বইবো।…আপনি বুঝবেন না …বসে বসে নিজের কথা ভাবছিলুম, এমন সময় আপনি এলেন! কি জানি, আপনাকে দেখে নিজের হীনতা, নিজের দৈন্য এত বেশী আমায় আকুল করে তুললো!…মনে হচ্ছে, আপনি যে এই আমার সঙ্গে কথা কইছেন আমার ভদ্র বেশ দেখে…যদি জানতেন, এ ভদ্র বেশের নীচে কি ইতর মন নিয়ে কি অভদ্র কাজে আমি দিন কাটাচ্ছি!

সুরেশের কথায় যেন স্রোত বহিল! সে স্রোতে কখন এক সময়

তার সব সঙ্কল্প, সব ইতিহাস প্রকাশ হইয়া পড়িল, সেদিকে তার খেয়াল রহিল না!

খেয়াল হইল তরুণীর কথায়। তরুণী কহিল,—রায় সাহেবের বাড়ী আজ রাত দশটার পরে?

তরুণীর দুই চোখে গভীর আতঙ্ক!

সুরেশ বলিল,—তাই। চাকরি আজ খতম করে দেবো। আর নয়। আপনার সঙ্গে বড় শুভক্ষণে দেখা হলো।...আমার মনে বিপ্লব চলেছিল, এমন সময় আপনি এলেন! আমার পাশে...ঐ চেয়ারে বস্‌লেন! আপনার পানে চেয়ে মনে হলো, আমার ভদ্রবেশ দেখে, আমাকে ভদ্র মনে করে আপনি এখানে বস্‌তে দ্বিধা বোধ করেন নি! যদি জান্‌তেন, আমার মনে কি নরক...কি করে আমার দিন চলে, তাহলে ঘৃণায় আপনি সরে যেতেন...হয়তো এ কাফেতে আমার প্রবেশের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন তুল্‌তেন। কিন্তু আর নয়! ভদ্র সমাজ থেকে বহু দূরে চলে এসেছি, আজ ভালো করে তা বুঝছি! প্রথমে ঐ মোটর-ড্রাইভার...একদিন ওদের চেয়ে নিজেকে ভদ্র মনে করতুম। আজ দেখি, ওরা খেটে খায়...চুরি-চামারি করে না। আমার চেয়ে অনেক মহৎ ওরা!

আবার এমনি কথার ঝড়! তরুণী তার পানে চাহিয়া রহিল। চোখের দৃষ্টি অবিচল। সুরেশ থামিলে তরুণী কহিল,—এ কাজ ছেড়ে দিন। এ পথ আপনার নয়...

সুরেশ কহিল,—ছেড়েই দেবো। আজ রাত্রে ডিউটি শেষ করে...

—রায় সাহেবের বাড়ী?...সেখানে কেউ থাক্‌বে না...খপর নেছেন সেই জন্য?

—বাড়ীর চাকর-বাকরদের সঙ্গে ভাব করে এ-খপর সংগ্রহ করতে হয়।

এক ঘণ্টা পরে। শাহনগরে একখানা এক-তলা বাড়ীর ঘরে তিনজনে বসিয়া কথা হইতেছিল। সুরেশ বলিল,—কাল থেকে আমি ছুটী নিচ্ছি। আমার দ্বারা এ-কাজ করা চলবে না।

গোবর বলিল,—একালে য়্যাডভেঞ্চারের নেশা ক্রমেই লোপ পাচ্ছে। এ-কাজ কিসে মন্দ? কোন্‌খানটায়? বুদ্ধি-বৃত্তি চালনা করে রোজগার! দুনিয়ার সর্ব্বত্র এই নিয়ম। ওকালতি, ব্যবসাদারী—কোন্‌টায় না নির্ব্বোধের দলকে ভুলিয়ে বুদ্ধিমানরা পয়সা রোজগার করছে, বলো?

সুরেশ বলিল,—সে তর্কের কোনো দরকার নেই। আজ রাত্রের পর থেকে আমার ইস্তফা।

লালমোহন বলিল,—তোমার চেহারা ভালো, বয়স কম, লেখাপড়া জানো…তাই তোমাকে দলে নেওয়া। বেকার-সমস্যা যে-রকম বাড়ছে, তাতে অনেককেই এ ব্যবসা অবলম্বন করতে হবে। ঐ বীড-গ্যাম্‌বলিং…বড্ড জানাজানি হয়ে গেছে, নাহলে ঐ পথে আমরা চলবো ভেবেছিলুম। সব ব্যবসাতেই এখন লেখাপড়া-জানা লোকের দরকার। চুরি-বিদ্যা বড় বিদ্যা! এ বিদ্যাকে এখন পাংক্তেয় করা চাই। কার সাধ্য, তোমায় সন্দেহ করবে যে তুমি চুরি-বিদ্যার অনুশীলন করছো?

গোবর বলিল,—যাই হোক, তোমার রুচি না হয়, আলাদা কথা! কিন্তু আজকের ডিউটি তো করছো?

—নিরুপায়ে।

—বেশ। আমি যাবো তোমার সঙ্গে। চাকর-বাকরদের নিয়ে আমি আসর জমিয়ে রাখবো, আর তুমি যাবে দোতলায়। নক্সাখানা দেখে নাও। রায় সাহেবের ডিস্‌মিস্‌-করা বেয়ারা এ নক্সা ছকে দেছে!

লালমোহন বলিল,—কিন্তু শুন্‌চো তো রায় সাহেবের বড় মেয়ে বাড়ীতে থাক্‌বে···এগজামিনের পড়া করতে?

হাসিয়া গোবর কহিল,—থাক্‌বে না! থাক্‌তে পারে না! না থাকার মন্ত্র আমি জানি।

গোবর ও সুরেশ পথে বাহির হইল, রাত্রি তখন পৌণে দশটা। পথে বড় একটা ডিসপেন্সারি। গোবর কহিল,—টেলিফোন্‌টা···

—বেশ।

গোবর টেলিফোন্ করিল রায় সাহেবের নম্বর দেখিয়া। রিসিভার তুলিয়া ডাকিল,—সাউথ ১২৩৪৫···হ্যালো···হ্যালো···

জবাব আসিল,—কে?

—রায় সাহেবের বাড়ী? ও···ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে এ্যাক্‌সিডেণ্ট···পালপাড়া আউটপোষ্টের কাছে···গাড়ী অচল। মিষ্টার রায় আর তাঁর স্ত্রীর জখম খুব বেশী···এখনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। তাঁদের কথায় ফোন করছি···আপনি তাঁর মেয়ে?···ও···হ্যাঁ, হ্যাঁ··· গাড়ী নিয়ে এখনি আসুন···পালপাড়া আউটপোষ্ট···তার একটু উত্তরে ···আউটপোষ্টে দেখা পাবেন। না, না, প্রাণের ভয় নেই···হ্যাঁ, এখনি আসুন···আপনার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়েছেন।

রিসিভার রাখিয়া গোবর দু' আনা পয়সা ফেলিয়া দিল। দিয়া সুরেশকে বলিল,—এসো···

পা চলিতে চায় না···তবু আসিতে হইল!

রায় সাহেবের বাড়ী। ফটক খোলা। অন্ধকার গৃহ। গোবর কহিল,—তুমি ঠাকুর?

সাম্‌নে ছিল উড়িয়া পাচক। সে কহিল,—হ্যাঁ।

গোবর বলিল,—তোমাদের দিদিমণি কোথায় গেলেন?

ঠাকুর বলিল,—গাড়ী নাকি বিগ্‌ড়েছে! বাবুরা আস্‌তে পারছেন না।

গোবর তার হাতে দিল বিড়ি। বলিল,—একটা চাকরি দেখে দিতে পারো ভাই?···

তার পর দু'জনে গল্প বেশ জমিয়া উঠিল।

সুরেশ দোতলার ঘরে। নক্সা-মাফিক দক্ষিণ-দিককার বড় ঘর··· আর্শি, চেয়ার, ড্রয়ারে চাবি। সেই চাবি দিয়া খুলিল আর্শি-লাগানো বড় আলমারি। সাম্‌নে মুক্তার বড় নেকলেশ···আরো কত জুয়েলারি! সুরেশ সেগুলা পকেটে পূরিল। তার পর বাহিরে বারান্দা···

ওদিককার ঘরে কিসের শব্দ! ঘরে আলো।···কে?

সুরেশ আসিল। পর্দা ঠেলিয়া উঁকি মারিয়া দেখে···আর্শির সামনে দাঁড়াইয়া একজন তরুণী! কেশ প্রসাধন করিতেছে! ও মুখ? ···চেনা!···ঠিক···

পর্দ্দা ঠেলিয়া ঘরে সে প্রবেশ করিল। আয়নায় তার মুখের ছবি ...তরুণী ফিরিল।

কুণ্ঠিত স্বরে সুরেশ কহিল,—আপনি!

হাসিয়া তরুণী কহিল,—হ্যাঁ! আপনাকে অবাক্ দেখছি কেন?

সুরেশ কহিল,—তখন আপনি সব কথা শুনলেন, কিন্তু একটিবার বল্‌লেন না তো যে আপনি রায় সাহেবের মেয়ে!

তরুণী কহিল,—শুধু কৌতুকের লোভে বলিনি।

সুরেশ কহিল,—আমায় ক্ষমা করুন। এ সব জিনিষ...না, নেবো না! আপনি নিন্। সাবধানে তুলে রাখবেন।

মুক্তার মালা, জুয়েলারি...সব সে তুলিয়া দিল তরুণীর হাতে। তরুণী কহিল,—বলেছি তো. এ পথ আপনার নয়...এ পথ ছেড়ে দিন।

সুরেশ বলিল,—তাই দেবো।..

টেবিলের উপরে ছিল সেই ভ্যানিটি ব্যাগ। ব্যাগ খুলিয়া তার মধ্য হইতে একতাড়া নোট বাহির করিয়া তরুণী সুরেশের হাতে নোটগুলা দিল, বলিল,—নিন্।...না, না, এ...নিতেই হবে। নতুন পথে চল্‌বার পাথেয় কিছু চাই...পঞ্চাশ টাকা...পাঁচখানা দশ টাকার নোট। না নিলে মনে আমি ভারী কষ্ট পাবো।

এ কথায় সুরেশের মন বিগলিত হইল! দু'চোখে জলধারা বহিল!

তরুণী আঁচল দিয়া তার চোখের জল মুছাইয়া দিল। দিয়া বলিল, —ঐ চোখের জলে সব গ্লানি মুছে গেছে!...কাঁদবেন না। আপনি পুরুষ...অল্প বয়স...জীবনকে একদিন সার্থক করতে পারবেন! আজকের রাত্রির কথা সেদিন মনে করবেন...সেই সঙ্গে আমার কথাও...

বিহ্বল চিত্তে সুরেশ বসিয়া পড়িল তরুণীর পায়ের কাছে…

তরুণী কহিল,—কি করেন! ছি, উঠুন! এর পরে যদি কখনো আর দেখা হয়…কোনো দিন…সেদিন বল্‌বো, আপনাকে দেখ্‌বামাত্র কি করে বুঝেছিলুম, আপনার মনের মধ্যে ঝড় বইছে! আজ নয়। আসুন, আর দেরী কর্‌বেন্ না। কেউ যদি এসে পড়ে?

সুরেশ চলিয়া আসিল…যন্ত্র-চালিতের মতো!

সেই ফটক! বামুন-ঠাকুরের পাশ কাটাইয়া সে আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইল।

গোবর আসিল, কহিল,—কি! পেলে?

সুরেশ কহিল,—পেয়েছিলুম সব…আনতে পারিনি। রায় সাহেবের মেয়ের সাম্‌নে পড়ে গেলুম…সব তাঁকে দিয়ে এসেছি!

—রায় সাহেবের মেয়ে! গোবর কহিল,—আশ্চর্য্য কথা! আমার ফোন্ পেয়ে তখনই তো তিনি চলে গেছেন চাকরদের নিয়ে ট্যাক্সিতে চড়ে সেই পালপাড়া আউটপোষ্ট!

—তবে এ-মেয়েটি?

—হুঁ!

দুজনে হতভম্ব।

সহসা একখানা ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইল ফটকের সামনে। এঞ্জিন থামিল না। গৃহ হইতে বাহিরে আসিল সেই তরুণী…ক্ষিপ্র পায়ে তরুণী উঠিয়া ট্যাক্সিতে চড়িয়া বসিল।

সুরেশ কহিল,—ঐ তো রায় সাহেবের মেয়ে!

—ওঁর হাতে দিয়েছো? সৃত্যি?

—হ্যাঁ।

গোবর ছুটিয়া আসিল ট্যাক্সির সাম্‌নে…ট্যাক্সি ততক্ষণে ছুটিয়াছে!

গোবর কহিল,—সর্ব্বনাশ করেছো! ও তো বিজ্‌লী! লেখাপড়া শিখেছে। ঢাকা থেকে একটা পাশ করে ও কলকাতায় আসে। সিনেমায় কাজ করতে গিয়েছিল। মেহনৎ বেশী, মাইনে কম…তাই এ-লাইনে এসেছে! ওরা একটা দল খুলেছে। এঃ, না বুঝে ছি, ছি, করেছো কি সুরেশ!

—ও বিজ্‌লী!

গোবর কহিল,—হ্যাঁ! তাই বলি, এ-ব্যবসাতেও যদি মেয়েরা এসে জোটে, তাহলে আমরা কোথায় যাই! লালমোহন বল্‌ছিল, মেয়েদের দলে নাও। আমি খেয়াল করিনি।…তুমি লেখাপড়া শিখেছো, মানুষ চেনো না? সুন্দর মুখ দেখে ভুলে গেলে! আরে ছ্যাঃ! এখন মেয়েদের দেখে ভুল্‌লে চল্‌বে না…জেনো, ওরা আজ নায়িকা নয়, প্রতিদ্বন্দ্বী…সাম্য-মৈত্রী-স্বাধিনতার কামান! আমাদের বুকে এসে পড়ছে ওদের বুদ্ধির গোলা…তাতে আমাদের মরণ! সাবধান!

শ্রীপদর সংসার

ক'পুরুষ ধরিয়া গ্রামে বাস। দু'ভাই··শ্রীপদ আর উমাপদ। চাষ-আবাদ আছে। ক্ষেত আছে, খামার আছে। গোয়ালে গরু, পুকুরে মাছ, বাগানে তরী-তরকারী, ফল-মূল। সঙ্গতিপন্ন সংসার। বহু আশ্রিত-পরিজন জায়গা জুড়িয়া বাস করে। তবে সেই প্রাচীন যুগ হইতে একই ধারায় সংসার চলিয়া আসিতেছে। কালের উপলখণ্ডে সে-ধারার কোনোখানে কোনোদিন বাধা নাই, বন্ধ নাই, পরিবর্ত্তনও নাই!

শ্রীপদ বড়। বয়স আটচল্লিশ বছর। উমাপদ অনেক ছোট, তার বয়স সাতাশ। দুটি বোন ছিল,—বিবাহ হইয়া গিয়াছে। স্বামীর ভিটায় তারা গিয়া সংসার পাতিয়াছে। মস্ত সংসার। ছেলেমেয়ে, গরু-গোয়াল,—কাজেই এ-বাড়ীতে তাদের আর আসা ঘটে না।

সংসারে ছিল বুড়ো মা—সম্ভ মারা গিয়াছে। শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিবার পর দেখা গেল, সংসারের বিলি-ব্যবস্থায় উলটপালট ঘটিতেছে। জন-মজুরের দল দু'বেলা পাত পাড়িয়া খায়; তাদের দেখাশুনা, ধান-চাল মাপাইয়া মরাইয়ে তোলা, রান্নাবান্না—লোকের হাতে নিত্য ফেলা-ছড়া হয়। শ্রীপদর গা করকর্ করিতে লাগিল।

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া সমস্যা-সমাধানের উপায় নির্ণয় করিয়া সেদিন শ্রীপদ আসিয়া ডাকিল,—উমা···

উমাপদ আসিয়া দাদার পানে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

শামুকের পিঠে যেমন ভারী খোলা—চলিতে ফিরিতে শামুককে সে-খোলা বহিয়া ফিরিতে হয়, উমাপদও তেমনি দাদার সকল ইচ্ছা মাথায় বহিয়া ফেরে চিরদিন···সেই জ্ঞান হওয়া ইস্তক! লোকে বলে,—দুটি ভাই যেন রাম-লক্ষ্মণ! অভাব শুধু সীতা দেবীর!

শ্রীপদ বলিল,—মা তো চলে গেল···সংসার রয়েছে, ক্ষেত-খামার, লোকজন—সব রয়েছে···এ-সব কে দেখে? মেয়েমানুষ না হলে সংসার চলে না। তুই বিয়ে কর্। বৌ এসে সংসার দেখবে। এ বয়সে আমার বিয়ে করা সাজে না!

উমাপদ কোনো জবাব দিল না। বৌয়ের নামে মনের কোণে শাড়ীর পাড়ের রেখা ফুটিয়া উঠিল, কাণে বাজিল গুঞ্জরী-পঞ্চমের মধুর সিঞ্জন! মাথার উপর আকাশের গায়ে কে যেন একরাশ আবীর ছিটাইয়া দিল!

শ্রীপদ বলিল—বেশ শক্ত-সমর্থ বৌ চাই। কচি মেয়ে আনলে তাকে দেখতেই জিভ্ বেরিয়ে যাবে। তা নয়, ডাগর বৌ।

এই অবধি বলিয়া শ্রীপদ চুপ করিল, উমাপদর পানে চাহিয়া রহিল। কেমন পাত্রী হইলে উমাপদ আর সংসার—দুয়ের সঙ্গে মানায়, তাই ভাবিতেছিল।

ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। মেয়ে দেখিয়া বৌ পছন্দ করিতে হয় কি করিয়া, তা তার জানা নাই। মেয়ে-জাতকে সে চেনে না। সে চেনে গরু-বাছুর, সে চেনে ধান-চাল, সে চেনে টাকা-কড়ির হিসাব-নিকাশ।

বলিল,—কালো মামাকে লিখে দি,—কলকাতায় থাকে—দেখেশুনে একটি মেয়ে ঠিক করে দেবে। শুধু তাই নয়। তুমি নিজেও সেখানে যাও·· বিয়ে করে একেবারে বৌ নিয়ে বাড়ী ফিরবে।

দাদার কথা চিরদিন সে শিরোধার্য্য করিয়া চলে, দাদার কথায় কখনো 'না' বলে না। কাজেই উমাপদ কলিকাতায় আসিল কালো মামার কাছে···শক্ত-সমর্থ ডাগর একটি বৌয়ের সন্ধানে।

কলিকাতায় কালো মামার মুদীর দোকান। মামার ব্যবসা-বুদ্ধির মূলে মামী,—কাজেই কারবারটি জাঁকালো। সংসার বড়। মামা আছে, মামী আছে, মামাতো ভাইবোন আছে, আর আছে মামীর একটি বোনঝী। ডাগর মেয়ে,—লেখাপড়াও কিছু শিখিয়াছে। মা-বাপ মারা গেলে তাকে আনিয়া মামী নিজের সংসারে আশ্রয় দিয়াছে।

বোনঝীর নাম দেবী। বয়স সতেরো পার হইয়াছে। মামীর মনে অনেকখানি দুশ্চিন্তা জাগিয়াছিল, বোনঝীকে আশ্রয় দেওয়া কঠিন নয়, পাঁচজনের সঙ্গে দুটা অন্ন দিতে গায়ে লাগে না, কিন্তু তার বিবাহ···সে যে অনেক টাকার খেলা!

উমাপদকে পাইয়া মামী কৃতার্থ হইয়া গেল। মামী থিয়েটার দেখে, বাঙলা টকি দেখে। বাঙলা গল্প-উপন্যাসেও মামীর দখল আছে। কাজেই মামী একদিন মামাকে বলিল,—বাইরে কোথায় মেয়ের সন্ধান করচো? ঘরে রয়েছে দেবী···

কালো মামা কহিল—তাইতো! দেখেছো, কি ভুলো-মন আমার!

মামী বলিল—জানি। তাই তো ভাবি, আমি না থাকলে কি যে হতো তোমার গতি!

কালো মামা বলিল—সে কথা আর বলতে!

৩

দেবীকে দেখিয়া উমাপদর ভালো লাগিল। চিরদিন গ্রামে থাকে—এ-বয়সের এমন মেয়েকে কাছাকাছি দেখিবার সুযোগ তার কখনো

মেলে নাই। তার উপর দেবীর ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে মামীর মনে চেতনা জাগিবামাত্র মামী তাকে ধুইয়া-মুছিয়া সাফ করিয়া নিত্য নব বেশে সাজাইয়া দেয়। উমাপদর জলখাবার দেবী আনিয়া ধরিয়া দেয় উমাপদর সামনে। পাণ আনে, সুপারি আনে। উমাপদর জামা-কাপড় গুছাইয়া আন্‌লায় তুলিয়া রাখে। উমাপদ বসিয়া দেখে। এ সেবা-পরিচর্য্যা এত ভালো লাগে যে বাড়ীর কথা, দাদার কথা, ক্ষেত-খামারের কথা···সব সে ভুলিয়া যায়।

বিবাহ করিতে এখানে আসিয়াছে, সে কথাও যেন ভুলিয়া গেল! সমস্ত মন ভরিয়া জাগিয়া আছে শুধু দেবী···

দেবী! দেবী!

কাজ নাই, কর্ম্ম নাই···ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে শহর-কলিকাতা দেখিয়া বেড়ায়! সময় বুঝিয়া ফিরিয়া আসে—অর্থাৎ যে-সময়টিতে দেবীর কোনো কাজ থাকে না—জানলার ধারে বসিয়া বই পড়ে, কিম্বা মামীর ঘুমন্ত ছোট খোকার কাছে বসিয়া তাকে চৌকি দেয় কিম্বা ছাদের কোণে বসিয়া বড়ি দেয়, টুকিটাকি আরো দুটো কাজ করে।

কখনো সে কিনিয়া আনে খেলনা-পুতুল। গণিয়া হিসাব করিয়া আনে। মামাতো ভাই-বোন, আর দেবী—হিসাবে কখনো ভুল করে না।

এমনি করিয়া দিনে দিনে এক মাস কাটিয়া গেল।

সেদিন মামী এবং মামার লটবহর লইয়া উমাপদ গিয়াছিল আলিপুরের চিড়িয়াখানায়। সারা দুপুর ঘুরিয়া শ্রান্ত দেহে গৃহে ফিরিল। মাথার যাতনায় কাতর। বেদনায় মাথা টন্‌টন্ করিতেছে, খসিয়া যাইবার জো!

চুপি চুপি গিয়া নিজের বিছানায় শুইয়া সে চোখ বুজিল। পাশের বাড়ীতে গ্রামোফোনে গান বাজিতেছে—

এসো কাছে, এসো কাছে!
তোমার কথায় আমার এ-মন
ভরে আছে।

মনে হইতেছিল, আজ সব বাধা ঠেলিয়া দেবীর উদ্দেশে তার মন আপনাকে যেন ঢাকিয়া রাখিতে পারিবে না!

বুকের উপরে গানের কথাগুলি জমিয়া উঠিতেছিল···মাথার ব্যথায় উমাপদ চক্ষু মুদিল।

হঠাৎ কেমন আরাম বোধ করিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মনে হইল, কপালের উপর কে যেন শীতল জলের পটি চাপিয়া দিতেছে···নাকের কাছে তীব্র একটি মিষ্ট গন্ধ!

চমকিয়া সে কপালে হাত দিল। অমনি হাতের মুঠিতে ধরা পড়িল একরাশ ফুল! তেমনি কোমল স্পর্শ!

কাণে ভাসিয়া আসিল মিষ্ট স্বর—মামী বললেঁ, তোমার মাথায় জলপটি দিতে।

এ স্বর দেবীর।

ঘরে আলো নাই। বাহিরে চাঁদের আলো···তারি এক-ঝলক জ্যোৎস্না খোলা জানলার মধ্য দিয়া ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে। উমাপদ কহিল,—তুমি! দেবী!

দেবী বলিল,—হ্যাঁ! বড্ড মাথা ব্যথা করচে?

—বড্ড।

—জলপটি দিলে সেরে যাবে। জলে ল্যাবেণ্ডার মিশিয়ে দিয়েছি।…আরাম বোধ হচ্ছে না?

—খুব আরাম!

কপালের উপর জলের পটি…দেবী মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে…উমাপদ দেবীর হাত ধরিল, কহিল,—এইখানটা…উঃ, যেন পুড়ে যাচ্ছে!

কতক্ষণ পরে মাথার যাতনা সারিল, মনে নাই।

মামী আসিয়া বলিল,—মাথা ব্যথা সারলো না বাবা?

—সেরেছে।

—তাহলে যা দেবী, খেয়ে নি'গে যা, মা। রাত দশটা বেজে গেছে।… আমি না হয় ততক্ষণ জলপটি দি।

দেবী চলিয়া গেল। মামী আসিয়া উমাপদর শিয়রে বসিল।

উমাপদ কহিল,—আর দরকার নেই, মামীমা, তুমি যাও। আমি ঘুমোই।

—কিছু খাবে না?

—না।

ভালো ঘুম হইল না। ঘুম আসে কোন্ সাত সমুদ্রের পার হইতে কত স্বপ্ন-মাধুরী বহিয়া…সে-ঘুম চকিতে ভাঙ্গিয়া যায়।

গল্প-উপন্যাসে পড়ি, এ বয়সে মানুষ এমন স্বপ্ন দেখে। দেখা স্বাভাবিক! চিকিৎসা-বিজ্ঞানে পড়ি, এ স্বপ্নে নাকি ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে না, স্বাস্থ্যহানিও ঘটে না!

দু'দিন পরে শ্রীপদর চিঠি আসিল। কালো মামাকে সে লিখিয়াছে, —উমাপদ ওখানে আর কতকাল বসিয়া থাকিবে? শুনিয়াছি, কলিকাতা মস্ত শহর। সেখানে পথে-ঘাটে মেয়ে পাওয়া যায়। একটা পাত্রী বাছিতে এত সময় লাগিবার কারণ বুঝি না। এখনো যদি পাত্রী না পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে উমাপদকে পাঠাইয়া দিবেন। এখানে যেমন করিয়া পারি, একটা পাত্রী আমি খুঁজিয়া লইব। ডাগর পাত্রীর জন্যই উমাকে ওখানে পাঠাইয়াছি। নহিলে ছোটখাট সাত-আট বৎসর বয়সের পুঁচকে পাত্রীর অভাব গ্রামে নাই।

চিঠি লইয়া মামা আসিল মামীর কাছে। মামী তখন নূতন বাঙলা টকির হ্যাণ্ডবিল পড়িতেছিল—ছেলেরা আনিয়াছে।

শ্রীপদর চিঠি পড়িয়া মামী বলিল—বেশ, তাহলে দিন দ্যাখো··· পুরুত ডাকাও।

পুরোহিত আসিল। দিন দেখা হইল; এবং শ্রীপদকে এ সংবাদ জানানো হইল। জবাবে শ্রীপদ লিখিল,—আমার এমন অবসর নাই যে বিবাহ দিতে ওখানে যাইব। আমার যাইবার কি বা প্রয়োজন? বিবাহ করিবে উমাপদ—তাহাকে তো পাঠাইয়া দিয়াছি ইত্যাদি।

বিবাহ হইয়া গেল।

এবার বাড়ী ফিরিতে হইবে। দুনিয়ার চেহারা যেন বদলাইয়া গেল! দুনিয়ার গায়ে বেশ রঙ ধরিয়াছিল···সে রঙ কে যেন তুলি বুলাইয়া মুছিয়া দিল। বাড়ী-ঘরের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল, এখন মনে পড়িল। দাদা বলিয়াছে, সংসার চালাইবার জন্য বৌ চাই! কিন্তু সে-সংসার···

যেন অতিকায় যন্ত্র! ছেলেবেলা হইতে দেখিয়াছে···এ সংসারে মায়ের এক-নিমেষ অবসর ছিল না! এ যন্ত্র মায়ের জীবনকে যেন আঁটিয়া-বাঁধিয়া রাখিত সারাক্ষণ! দেবীকেও তেমনি এ যন্ত্রে বাঁধিয়া জুতিয়া দিতে হইবে?

জ্যোৎস্না, দক্ষিণ বাতাস···এগুলা এত ভালো, উমাপদ এখানে আসিয়া বুঝিয়াছে। তার আগে ভাবিত···ওগুলার কি প্রয়োজন?

উমাপদ নিশ্বাস ফেলিল। দেবী সেখানে যাইবার জন্য আকুল! কত কথা বলে। বলে,—নিজের ঘর, নিজের সংসার···দেখো, কেমন সব গুছিয়ে চালাবো। বড়-ঠাকুরকে কিছু বলতে হবে না।

বড়-ঠাকুর! উমাপদ বিস্ময় বোধ করিল! যে-শ্রীপদকে দেবী জানে না, কখনো দেখে নাই,—তার তৃপ্তি, তার সেবা, তার পরিচর্য্যার কত কল্পনাই দেবী মনে মনে করিয়া রাখিয়াছে! যেন কত দিনের আত্মীয়তা!

ট্রেণ হইতে গ্রামের ষ্টেশনে নামিয়া বৌকে গরুর গাড়ীতে তুলিয়া উমাপদ যখন গৃহে পৌঁছিল, বেলা তখন প্রায় তিনটা। ঝাঁ-ঝাঁ রৌদ্র···দেবীর টুকটুকে মুখখানি শ্রান্তি-অবসাদে শুকাইয়া গিয়াছে, তবু আনন্দের গভীর আবেগে মন ভরিয়া আছে! বাঙালীর ঘরের মেয়ে···তায় অনাথিনী আশ্রিতা···স্বামীর সঙ্গে নিজের ঘরে আসিতেছে···তার আপন-ঘর, চিরদিনের ঘর···রৌদ্রে এত ঝাঁজ, দেবী তা টের পাইল না!

ঐ মাঠ···জলা···ঐ ভাঙ্গা কুঁড়ে-ঘর···মেটে পথ··আইলের উপর

দিয়া গাড়ী চলিয়াছে, পথে মাঝে মাঝে দু'একজন লোকের দেখা মেলে, বেশে-ভূষায় স্বাতন্ত্র্য···এ-সব দেবীর এত ভালো লাগিতেছে!

ওটা কি-গাছ? শিমূল! তুলার গাছ? ও! ওটা কি-পাখী? গাঙচিল! ঐ বুঝি লাঙ্গল? ঐ ধানগাছ? ওমা, অতটুকু! ঐ ছোট গাছে এত ধান হয়···বাঃ!

উমাপদ বলিল—ঐ আমাদের বাড়ী।

ঐ!···কোনো আয়োজন নাই! নিতান্ত সহজ রুক্ষ মূর্ত্তি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে! দ্বারে কেহ দাঁড়াইয়া নাই!···বৌকে বরণ করিবে না?

গাড়ী থামিল। উমাপদ হাত ধরিয়া দেবীকে গাড়ী হইতে নামাইল। দু'চারজন জন-মজুর খাটিতেছিল। গাড়ীতে ছিল দেবীর একটা টিনের প্যাঁট্‌রা···উমাপদর প্যাঁটরা! একজন মজুরকে ডাকিয়া উমাপদ বলিল—গাড়ী থেকে নামিয়ে নে।

শাঁখ বাজিল না···কেহ হুলুধ্বনি দিল না! দেবী স্বামীর গৃহে প্রবেশ করিল। দাদা বাড়ী নাই; এ সময় ক্ষেতে থাকে। গৃহে ছিল কতকগুলা পোষ্য। তারা আসিয়া দেবীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কেহ বলিল—বৌমা···কেহ বলিল,—বৌদি···

উমাপদ ডাকিল—লক্ষ্মীর মা···

লক্ষ্মীর মা পুরানো দাসী। লক্ষ্মীর মা কহিল—এই যে···

উমাপদ কহিল—ভাতটাত আছে? না, রাঁধতে হবে?

লক্ষ্মীর মা বলিল—এত বেলায় কেউ উপোসী থাকে কোনো দিন? রাঁধতে হবে বৈ কি।

—চট্ করে ব্যবস্থা করো। আমি চান করতে যাই। দেবীর পানে চাহিয়া উমাপদ কহিল,—লক্ষ্মীর মা তোমাকে পুকুর-ঘাটে

নিয়ে যাবে, চান করে নাও। দেরী করো না। সন্ধ্যা হতে বেশী দেরী নেই।

আহারাদি সারিয়া উমাপদ ছুটিল ক্ষেতে দাদার কাছে। এখনো বেলা আছে, ডিউটি করা চাই—এ বাড়ীর সনাতন নিয়ম।

দেবী একা···বাড়ীর পাঁচজনে তাকে ঘিরিয়া বসিল। তার কাহিনী শুনিতে লাগিল। শহর কলিকাতা···তার মাসিমা-মেসোমশায়···ট্রাম, মোটর, বাস···সে যেন রূপ-কথার গল্প!

সন্ধ্যার সময় শ্রীপদ গৃহে ফিরিল;—সঙ্গে উমাপদ। দেবী আসিয়া প্রণাম করিল, সামনে মুখ-হাত ধুইবার জল ধরিয়া দিল। কেহ তাকে শিখায় নাই। উমাপদর কাছে এখানকার কথা সে শুনিয়াছিল; শুনিয়া অবধি এখানকার কাজ-কর্ম্মের প্রোগ্রাম সে মনে মনে ছকিয়া লইয়াছে।

মুখ-হাত ধোওয়া হইলে লক্ষ্মীর মা আসিয়া কহিল,—বৌয়ের মুখ ছাখো গো, বড় দাদাবাবু। নিয়ম।

শ্রীপদ মুখ দেখিল। পছন্দ হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। এ মুখ দেখিবে, তা যেন সে ভাবে নাই! এ মুখ দেখিলে মনে হয় না, দেবী-বৌ এত বড় সংসার-যন্ত্রের ভারী চাকা দু'হাতে ঘুরাইতে পারিবে! এ দেহে দশভুজার বিপুল শক্তির আভাস নাই! এ মুখ দেখিলে ভয় বা শ্রদ্ধা হয় না···মমতায় মন ভরিয়া ওঠে! মুখে শুধু একটি কথা জাগে, আহা!

কথায় কথায় শ্রীপদ কহিল,—ঘর-সংসার সব দেখিয়েছিস রে, লক্ষ্মীর মা ?

লক্ষ্মীর মা বলিল,—ওমা, একটু জিরুক্। এই তো বাছা এলো··· মুখখানি শুকিয়ে যেন আম্সী !

শ্রীপদ কহিল,—হুঁ !

পরের দিন সকালে শ্রীপদ ডাকিল,—উমা···

উমাপদ আসিয়া কহিল,—দাদা···

শ্রীপদ কহিল,—এ্যাদ্দিন বসে বসে এ কি মেয়ে বিয়ে করলি ! এঁ্যা ! আমাদের সংসারে কি ও বৌ চলবে ? লেখাপড়া জানে বুঝি ?

বিনীত মৃদু স্বরে উমাপদ কহিল—জানে।

—বুঝেচি। তা বেশ, তোর পছন্দ হয়েছে, বিয়ে কয়েছিস্— ভালো ! কিন্তু সংসার দেখতে যদি না পারে, তাহলে কিছুই রাখা যাবে না !

উমাপদ কোন জবাব দিল না···দাদার কথাগুলা বুকে বাজিল শেলের মতো !

শ্রীপদ কহিল—একবার তোর বৌকে ডাক্। জিজ্ঞাসা-পড়া করি, সব বুঝি। ব্যবস্থা করা চাই তো।

দেবী আসিল। শ্রীপদ কহিল,—খড়-বিচুলি কাটতে পারো বৌমা ?

দেবী নীরব।

—ইঁদারা থেকে জল তুলতে পারবে ?

—পঞ্চাশজন লোকের ছ'বেলা রান্না ?

—মরাইয়ে ধান তোলা ? ··

—ঢেঁকিতে ধান কোটা ?

মলিন ম্লান মুখে দেবী কহিল,—শিখে নেবো।

শ্রীপদ কহিল,—হুঁ। ·· ,

উমাপদ কাঠ! সে যেন মস্ত অপরাধ করিয়াছে এ সংসারে দেবীর মতো বৌ আনিয়া! এ অপরাধে কি-শাস্তির ব্যবস্থা হয়, ভাবিয়া সে আকুল!

শ্রীপদ কহিল,—তা বেশ! বৌ! তাকে তো ফেলতে পারবিনে! এক কাজ কর্···দোতলার ঘরে ঠাকুর আছেন, তাঁকে নামিয়ে সেই ঘরে শয্যা করে দে···ফুল-বিল্বপত্তর দিয়ে এ বৌকে পূজো করবি! এ বৌ নিয়ে সংসার চলবে না।···তোর কিছু বুদ্ধি হলো না রে! ভগবানের দেওয়া নয়, নিজে দেখে বিয়ে করবি, তাতেও ভুল করলি! বেশ মোটাসোটা গ্যাটা-গোঁটা বৌয়ের অভাব আছে? হুঁঃ! খুঁজলে পাওয়া যায় না? দরকার হলে আমাদের ঘরে অমন পঞ্চাশ ঘড়া জল সাঁ-সাঁ করে তুলে দেবে···বিশ-ত্রিশটা গরুর খড় পাঁচ মিনিটে কেটে ডাঁই করে তুলবে!···মাকে তো দেখেছিলি···জেনে-শুনে·· যাক, তোর অপরাধ নেই। বিয়ে তো এর আগে করিস্ নে কখনো!··· লোকে দেখে শেখে, নয় ঠেকে শেখে···তা তোর দু রকম শেখার কোনোটাই হয় নি!

নিশ্বাস ফেলিয়া শ্রীপদ ক্ষেতে চলিয়া গেল। বলিয়া গেল,— বৌকে চা খাওয়াবার জন্য যেন ঘরে বসে থাকিস্ নে···এ্যাদ্দিনের অনেক কাজ বাকী পড়ে আছে। বামুনপাড়ার দিকে যা। পুকুরটা ঝাঁজিতে ভর্ত্তি হয়ে গেছে···দুটো জন নিয়ে জাল টেনে ঝাঁজিগুলো তুলে

ফেলাবি। আজই পুকুর সাফ করা চাই। ওটা জমা নেবার জন্য লোক আসা-যাওয়া করছে।

শ্রীপদ চলিয়া গেলে দেবীর পানে চাহিল উমাপদ। ভয়ে বেচারী একেবারে নীল হইয়া গিয়াছে! মমতায় তার প্রাণ দুলিয়া উঠিল। সেখানে আর কেহ ছিল না। উমাপদ তাকে একেবারে বুকে চাপিয়া ধরিল।

দেবী কাঁদিল। দু'চোখে ঝর-ঝর ধারে···যেন বন্যা!

তাকে এক-রকম বুকে করিয়া উমাপদ নিজের ঘরে আনিল—চুম্বনে তার মুখ অভিসিঞ্চিত করিয়া বলিল,—কেঁদো না, দেবী। দাদা একটুতে বকে···একটুতে রাগ করে। তা হলেও ভালোও বাসে খুব।

এ-কথায় দেবীর মন প্রবোধ মানিল না। স্নেহের উত্তাপে অশ্রুর ধারা আরো বিগলিত, আরো উৎসারিত হইল! উমাপদ কি বলিয়া প্রবোধ দিবে? কি-বা সান্ত্বনা?

যে-পৃথিবীকে কাল সবুজ শ্যামল দেখিয়া নয়ন-মন তৃপ্তিতে ভরিয়া গিয়াছিল, আজ শ্যামল শোভা ঘুচিয়া দারুণ রুক্ষতায় সে পৃথিবী ভরিয়া উঠিল!

নিরুপায়!

শ্রীপদর সেবায় দেবী প্রাণ-মন ঢালিয়া দিল। কিন্তু কেমন গ্রহ,—একটা না একটা ত্রুটি নিত্য ঘটে। ভাগ্যকে দেবী অভিশাপ দেয়···মন তাহাতে তৃপ্তি পায় না।

উমাপদ ভাবিয়াছিল, জীবনের পথ মরুময় নয়···সে পথের দুপাশে আছে কানন, নির্ঝর, গিরি-নদী, পাখীর কল-গান! আকাশে বাদল যেমন ঝরে, তেমনি আবার জ্যোৎস্নার দীপ্তিও ফোটে···

কিন্তু সব এখন কেমন একাকার হইয়া গেছে!

বসন্ত আসিয়া জীবনের দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল···তাকে রাখা গেল না! কখন সে আসিল, কখন গেল, উমাপদ জানিল না,—মনের একপ্রান্তে বসন্তর পায়ের চিহ্ন রহিয়া গেল শুধু ছোট একটু সোনালি রেখায়!

কাজ···কাজ···কাজের জোয়ারে উমাপদ গা ভাসাইয়া দিল। থাকিয়া থাকিয়া মনকে কে যেন বজ্র-বাঁধনে চাপিয়া ধরে! বেচারী দেবী হাস্যে-ভাষ্যে কতখানি জীবন্ত! তার প্রাণের লীলা-ছন্দে কত মাধুরী···তাকে ভালো বাসিব, সে অবসর কোথায়!

জ্যোৎস্না-নিশীথে বিছানায় পড়িয়া কত কথা ভাবে। একদিন পথ হইতে একরাশ ঝরা বকুল কুড়াইয়া আনিয়াছিল! ভাবিয়াছিল, দেবী ঘরে আসিলে দুজনে বসিয়া সে-ফুলে মালা গাঁথিবে! গাঁথিয়া···

শুইয়া শুইয়া উমাপদ ঘুমাইয়া পড়িল···কত রাত্রে সংসারের কাজ-কর্ম্ম সারিয়া দেবী ঘরে আসিল···জানিল না!

সকালে ঘুম ভাঙ্গিলে কোনোদিন সে দেবীকে শয্যায় নিজের পাশে দেখিল না! কখন সে ঘুমাইতে আসে, জাগিয়া কখন আবার বাহিরে চলিয়া যায়···অজানা রহস্য!

উমাপদ কহিল,—একটি দিন শুতে এসে আমায় ডেকো, দেবী তোমাকে আদর করবো, তোমার আদর আমি নেবো।

হাসিয়া দেবী জবাব দিল,—সারাদিন যে-খাটুনি খাটো···কোন্ প্রাণে তোমাকে ডাকবো গো! বড্ড মায়া হয়। না হলে আমারো কি সাধ হয় না···

বাষ্পোচ্ছ্বাসে কথা শেষ হইল না। দুই চোখের পিছনে অশ্রুর লহর আসিয়া জমিল।

উমাপদ বলিল,—তোমাকে এনে একটি দিনের জন্য সুখী করতে পারলুম না! খেটে খেটে তোমার জান বেরিয়ে গেল!

হাসিয়া দেবী বলিল—কোন্‌খান্‌টায় আমায় অসুখী দেখলে! এত বড় সংসারে আমি গিন্নী! এত লোকজন···অভাব কাকে বলে, জানি না। মেয়ে-মানুষ এর বেশী কি চায়, বলো তো?

উমাপদর বুকের মধ্যটা হা-হা শ্বাসে ভরিয়া উঠিল। উমাপদ কহিল—এ বয়সে এইটেই তোমার সব-চেয়ে বড় চাওয়া, দেবী··· এ-কথা আমায় তুমি বিশ্বাস করতে বলো?

উমাপদর স্বর বাষ্পার্দ্র।

দেবী কহিল,—পাগলামি করো না···ছি! আমার মনে সত্যি কোন দুঃখ নেই। বিশ্বাস করো···কি যে চাই, কাজ-কর্ম্মের মধ্যে তা ভাববার সময়ও নেই!···ভালো কথা, আজ সকালে বড়-ঠাকুর আমায় কি দিয়েছেন···দেখেচো?

কথাটা বলিয়া বাতাসের ঝলকের মতো দেবী ঘরের বাহিরে গেল। একটু পরে ফিরিল···হাতে কাগজের মোড়ক। মোড়ক খুলিয়া দেখাইল, গিনি সোনার একছড়া গোট-হার। বেশ বড়।

দেবী কহিল—বড়-ঠাকুর কত সুখ্যাতি করলেন। আমার উপর কত খুশী! সব কাজ আমি করতে পারি—জানো! এটা দিয়ে বললেন,

সামনের বুধবারে ভালো দিন আছে—ছারছড়া পুরুত-ঠাকুরকে দিয়ে ঠাকুরের পায়ে ছুঁইয়ে গলায় পরো।

দেবীর মুখে হাসির উচ্ছ্বাস! পাথরের পুতুলের মতো নিস্পন্দ বসিয়া উমাপদ সে-হাসি দেখিল। ও-হাসির পিছনে কি নিবিড় কালো মেঘ পুঞ্জিত হইয়া আছে, তারো আভাস যেন সে দেখিল!

কিন্তু উপায় কি! এত বড় সংসারে দেবী গৃহিণী! সে তার প্রেয়সী নয়! কোনোদিন প্রেয়সী বলিয়া তাকে বুকের আসনে বসাইবে, সে অবসরও মিলিল না! অপরাধ দেবীর নয়!…তারো নয়!…

উমাপদর জীবনে সুখ নাই। থাকিয়া থাকিয়া ভাবে, বাঁচিয়া কি হইবে? পরক্ষণে শিহরিয়া ওঠে, না, দেবী! সে-ছাড়া দেবীর কেহ নাই! মরা হইবে না। মরিয়া মরিয়া যেমন করিয়া হোক, তাকে বাঁচিতেই হইবে।

এবং মরিয়া মরিয়াই উমাপদ বাঁচিয়া রহিল শুধু দেবীর মুখ চাহিয়া!

ক'মাস পরের কথা। হঠাৎ সেদিন পৃথিবীর বুকে পুষ্প-গন্ধে যেন বন্যা বহিয়াছিল! সে বন্যার বেগ আসিয়া লাগিল প্রাণের কূলে…

রাত্রে ঘন-ঘোর বর্ষা। বাজের গর্জ্জন…বিদ্যুতের ঝলক! সারা দুনিয়া বুঝি উলট-পালট হইয়া যায়! নিয়ম-রীতিতে বিপ্লব! যে গাছ বাতাসের দোলায় মৃদু কম্পনে আরাম দিত, সে গাছকে ভাঙ্গিয়া উপড়াইয়া দিবার জন্য বাতাস আজ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে! যে নদী

বুকে তরণী বহিয়া যাত্রী পার করিত, সে নদী আজ সেই তরণীকেই উল্টাইয়া ডুবাইয়া দিবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে! শুধু শ্রীপদর সংসারে বিশৃঙ্খলা নাই, বিপ্লব নাই···একই ধারায় সংসারের যন্ত্র ঘুরিয়া চলিয়াছে···দেবী দু'হাতে সে-যন্ত্র ধরিয়া সংসার চালাইতেছে!

রাত্রি গভীর। নিজের ঘরে উমাপদ গুম্ হইয়া বসিয়া আছে। চোখে ঘুম নাই।

সহসা হুঙ্কার-শব্দে কাছে কোথায় বজ্রপাত হইল। সারা বাড়ী ঝন্-ঝন্ শব্দে কাঁপাইয়া আগুনের তীব্র শিখা ফুটিয়া ছুটিয়া গাঢ় অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল!···

দেবী···দেবী কোথায়? কি করিতেছে?

উমাপদ উঠিল। ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইল আঙ্গিনার ধারে। বিদ্যুতের চমক···সে-আলোয় উমাপদ দেখে, রান্না-ঘরের বাহিরে দাওয়ার উপরে কে যেন পড়িয়া আছে!

ছুটিয়া উমাপদ কাছে আসিল। দেবী! ডাকিল,—দেবী··· দেবী···

কোন্ সুদূর পাতালের অতল-তল হইতে দেবী জবাব দিল —উঁ···

বুকে তুলিয়া দেবীকে সে ঘরে আনিল। দেবীর কাপড়চোপড় ভিজিয়া গিয়াছে···তবু সারা দেহে আগুনের ঝাঁজ! দেবীর গা পুড়িয়া যাইতেছে···

ভিজা কাপড় ছাড়াইয়া শুশ্রূষা করিয়া উমাপদ জানিল, আজ দু'দিন ধরিয়া দেবীর জ্বর এবং এ বেলায় জ্বর বাড়িয়া ছিল; সংসারের

কাজ চুকাইয়া শুইতে আসিবে, এমন সময় ঐ প্রচণ্ড বজ্রনাদ এবং বিদ্যুৎ-বহ্নির তীব্র ঝলক্! ভয়ে পা পিছলাইয়া সে পড়িয়া যায়··

পরের দিন সকালে উমাপদ বলিল—তুমি শুয়ে থাকো। দাদাকে আমি বলি তোমার অসুখ···চিকিৎসার ব্যবস্থা হোক।

মিনতি-ভরে দেবী কহিল,—না গো না, তোমার পায়ে পড়ি, কিছু করতে হবে না। আমার এ-জ্বর নাইতে-খেতে সেরে যাবে। লক্ষ্মীর মা বলছিল, ম্যালেরিয়া···এ দেশে এ জ্বর সবার হয়।

উমাপদ কহিল—না দেবী, শোনো···

দেবী শুনিল না। মিনতি করিয়া, পায়ে ধরিয়া উমাপদকে চুপ করিয়া থাকিতে বলিয়া দেবী গেল শ্রীপদর সংসার দেখিতে।

উমাপদ দাদার কাছে আসিল, ভাবিল, কথাটা বলিবে···

পারিল না। কোনো দিন কোনো কথা বলিতে পারে না। এ বাড়ীতে কথা বলিয়াছে চিরদিন তার মা···আর তার দাদা। সে শুধু কথা শুনিয়া এতগুলা বৎসর কাটাইয়া আসিয়াছে! সে প্রথম কথা বলিয়াছে মন খুলিয়া দেবীর সঙ্গে!···সে-কথাও যদি অবাধে কহিতে পারিত, মনে তাহা হইলে আজ এমন পাহাড় জমিয়া উঠিত না!

শ্রীপদ কহিল—কি খপর?

অত্যন্ত কুণ্ঠাভরে উমাপদ কহিল,—না···মানে···

শ্রীপদর হাতে ছিল মস্ত হিসাব,—উমাপদর দিকে সে-হিসাব আগাইয়া দিয়া বলিল—এটা ছাখো···ময়নাখালির রেয়তি আদায়ের হিসাব। অনেক টাকা বাকী পড়ে আছে। আমি বলি, দেরী নয়। আজই তুমি সেখানে যাও। গিয়ে বলবে, দু'দিনের মধ্যে যদি

আদায় বুঝিয়ে না দেয়, তাহলে পরের দিনে আদালতে নালিশ রুজু করা হবে।

উমাপদর মুখ শুকাইল। বুকে কে হাতুড়ি ঠুকিতে লাগিল! দেবীর এই জ্বর···তাকে কে দেখিবে? ভাবিয়াছিল, ক্ষেতে একবার বাহির হইবে দাদার সামনে·· তার পর কোনো একটা ছুতা তুলিয়া চুপিচুপি ফিরিয়া আসিবে!

শ্রীপদ কহিল—আমি দাঁড়াতে পারচি না। আজ ওদিককার পাঁজা উঠবে।···মোদ্দা, এ কাজটায় দেরী নয়। এখনি বেরিয়ে পড়ো···এসে ওবেলায় খাওয়া-দাওয়া সেরো। চট্‌পটে না হলে বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করা যায় না।

শ্রীপদ কাজের মানুস···কথা কহিয়া সময়ক্ষেপ করে না। সে গেল পাঁজার তদ্বির করিতে; উমাপদ কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিষয়-সম্পত্তি! কার জন্য বিষয়-সম্পত্তি? মানুষের জন্য বিষয়? না, বিষয়ের জন্য মানুষ?

দুঃখ হইল। নিজের উপরে রাগ হইল। এ-সব কথা নিজের মনে আলোচনা করিয়া ফল নাই! এ-কথা কওয়া উচিত দাদার সঙ্গে।

বাড়ী ফিরিতে সন্ধ্যা হইল। দেবী আসিয়া কহিল—কেমন মানুষ তুমি! না খেয়ে না দেয়ে সারা দিন কোথায় থাকো, বলো তো? ভাবনায় আমার পাগল হবার জো!

এ ভর্ৎসনায় কতখানি স্নেহ···সারা দিনের ক্লান্তি নিমেষে মুছিয়া গেল। হাসিয়া উমাপদ কহিল—তুমি কেমন আছো?

দেবী ভ্রূকুটি করিল, কহিল,—থাক, আর আদরে কাজ নেই। মরে গেছি কি বেঁচে আছি, সে-খপরে তোমার দরকার?

উমাপদর বুকে বাজিল। সে কহিল,—চলে যেতে হলো অনেক দূরে···দাদা বললে, জরুরি কাজ···তাই।

—আমাকে সে-কথা বলে গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হতো?

উমাপদ কহিল,—মনটা কেমন হয়ে গেল···তোমার অসুখ···এদিকে কাজ···

দেবী কহিল—থাক, আমার অসুখের জন্য তোমার তো ঘুম হচ্ছিল না!···এখন দয়া করে চানটুকু সেরে নাও। নিয়ে এসো। খাবে।

কথাটা বলিয়া দেবী দাঁড়াইল না—চলিয়া গেল।

স্নান সারিয়া উমাপদ আহারে বসিল। দেবী বসিল কাছে। উমাপদ কহিল—কেমন আছো, বলবে না?

দেবী কহিল—ভালো আছি গো, ভালো আছি।

উমাপদ কহিল—কি খেলে?

দেবী কহিল—হাওয়া।

হতভম্বের মতো উমাপদ তার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। দেবী হাসিল। স্বামী ব্যথা পাইয়াছে, বুঝিল। হাসিয়া কহিল,—কি করে খাবো, বলো? তুমি রইলে উপোসী! মেয়ে-মানুষের খেতে আছে না কি স্বামীর খাওয়া না হলে?

উমাপদ কোনো কথা বলিল না। মনে যেন রামধনুর খেলা চলিয়াছে···রঙের বিচিত্র লীলা! এই স্নেহ, এই মায়া, মমতা-প্রীতি ···আঃ!···এত পাইয়াও সে মরিতে চায়! পৃথিবীর বাহিরে এমন প্রীতি, এমন স্নেহ আছে না কি?···

আধ ঘণ্টা পরে। শ্রীপদ আহারে বসিয়াছে···উমাপদ ঘরে বসিয়া ময়নাখালির হিসাব লইয়া মত্ত···দাদার আদেশ, রায়তদের আজই বাকী-বকেয়ার স্বতন্ত্র ফিরিস্তি লিখিয়া দিতে হইবে। দু'দিন পরে সে-হিসাব লইয়া ভোরে উকিলের বাড়ী যাওয়া চাই।

হঠাৎ তীব্র ভর্ৎসনা!···কাহাকে? উমাপদ কাণ খাড়া করিয়া বসিল।

তারপর ক্ষণেক স্তব্ধতা এবং শ্রীপদর স্বর আরো তীব্র হইল। শ্রীপদ বলিল—মেয়ে-মানুষের যেটুকু করবার, তা করবে না? কিসের জন্য ভাইয়ের বিয়ে দিয়ে তোমাকে এনেছি! সংসারে বিধি-ব্যবস্থাগুলো যাতে ভালো হয়,—তাই না?

বকাবকির মধ্য দিয়া ভোজন-কর্ম্ম চুকাইয়া শ্রীপদ আসিয়া ডাকিল,—উমা···

উমাপদ দাদার পানে চাহিল···দু' চোখে অপরাধীর কুণ্ঠিত দৃষ্টি।

শ্রীপদ বলিল—আমি একবার যাচ্ছি সনাতনের ওখানে—তার মার খুব অসুখ। কবিরাজ-মশায়কে একবার বলে দিতে হবে, গিয়ে যেন দেখে আসেন।

শ্রীপদ চলিয়া গেল। উমাপদ আসিল রান্নাঘরের সামনে···ঘরে বসিয়া দেবী। তার দু চোখে জল-ধারা···সামনে দু-দুটা উনুনে চাপানো বড় বড় হাঁড়ি। ভাত ফুটিতেছে।

উমাপদ ডাকিল—দেবী···

দেবী চমকিয়া তার পানে চাহিল।

উমাপদ আসিয়া তার পাশে বসিল। রান্নাঘরের দ্বার ভেজাইয়া দিয়া বসিল। কহিল—কি করে দুধ পুড়লো?

দেবী কহিল—আমার দোষে।

—তার মানে ?

—তুমি খাচ্ছিলে···তেতে পুড়ে এলে, কাছে বসেছিলুম। উনুনে দুধের কড়া বসানো ছিল, মনে ছিল না।

—সে-কথা দাদাকে বললে না কেন ?

—তাতে যদি আরো রাগ করেন ?

উমাপদ কোনো জবাব দিল না। কি জবাব দিবে ? একটা লোক বারো মাস কাজ করিতেছে···একদিন যদি একটা ত্রুটি হয়···

কিন্তু এ-কথা কাহাকে বুঝাইবে ?···

উমাপদর দোষ। কেন বলিবে না ? বলা উচিত ! দেবীকে রক্ষা ও পালন করা তার কর্ত্তব্য ! সে-কর্ত্তব্য···

উমাপদ কহিল—তোমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে···

মৃদু হাস্যে দেবী কহিল—হ্যাঁ, হচ্ছে। তা কি করতে হবে, শুনি ?

—একবার তোমার মাসিমার কাছে যাবে ? দুদিন ঘুরে আসবে ?

—না।

উমাপদ অবাক্ ! দেবী কহিল—তুমি যাও দিকিনি এখান থেকে। পুরুষ-মানুষ রান্নাঘরে এসে বসেছো, লজ্জা করে না ?

গভীর রাত্রে শুইতে আসিয়া দেবী দেখে, উমাপদ ঘুমায় নাই··· বিছানার উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

সে আসিয়া কাছে বসিল, বলিল—রাগ করেচো ?

—না। তবে একবার ঘুরে এলে ভালো হতো ! খেটে খেটে তোমার চেহারা যা হয়েছে···

হাসিয়া দেবী কহিল—কার সংসারে খাটছি ?

উমাপদ কহিল,—জানি। তবু তো লোকের বাড়ী দেখি, বৌয়েরা মাঝে মাঝে বাপের বাড়ী যায়। তোমার মা-বাপ না থাকতে পারেন, মাসিমা আছেন, মেসোমশায় আছেন।······সত্যি, তুমি হাঁফ ফেলে দুদিন জিরুতে পাবে না ?

দেবী কহিল—না।

—যেতে চাও না ?

—না।

—কেন ?

—তোমাকে ছেড়ে কোথাও গিয়ে আমি আরাম পাবো না··· জানো ?

—দেবী···দেবী··

স্বামীর আদরে দেবীর সব দুঃখ-কষ্ট, ভর্ৎসনার সব জ্বালা কোথায় উবিয়া গেল !

উমাপদকে যাইতে হইল মকর্দ্দমা রুজু করিতে···ফিরিতে দু'চার-দিন দেরী হইবে। দেবী কহিল—সাবধানে থেকো।

উমাপদ কহিল—নিশ্চয়।

দেবীর কি যে হইয়াছে ! যে-সংসারে নিজেকে ডুবাইয়া দিয়াছিল, সে-সংসার তাহাকে ছুড়িয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয় ! কাজে ভুল হয়···এটা করিতে ওটা করিয়া বসে ! দেবীর আতঙ্ক হইল, পাগল

হইবে না কি ! মানুষের স্বামী নিত্যদিন এমন স্ত্রীর পাশে বসিয়া থাকে না ! তার স্বামীকেই বা কাছে কাছে পাশে পাশে সে কতখানি পাইয়াছে !

তবু রাত্রে···

তাও দেবী যখন ঘরে আসে, স্বামীকে দেখে কোনোদিন নিদ্রামগ্ন, কোনোদিন নিদ্রাতুর ! তবু···তবু···এক-শয্যায় স্বামীর পাশটিতে পড়িয়া থাকিয়া তার কোথাও কোনো দুঃখ, কোনো অভাব থাকে না যে !···

কাজের ভুলের জন্য ভৎসনা ! শ্রীপদর স্নেহ বাহিরে তেমন প্রকাশ পায় না···বিরাগ কিন্তু প্রকাশ পায় নিমেষে ! যেদিন উমাপদ চলিয়া যায়, সেদিন শ্রীপদ আসিয়া দেবীকে ডাকিল,—বৌমা···

দেবী আসিলে শ্রীপদ তার হাতে নগদ পঞ্চাশটা টাকা দিয়া বলিল,—এ টাকা তোমার। নতুন পুকুরে মাছ ফেলেছিলুম তোমার নাম করে। সে মাছ একজন জমা নিলে···তার টাকা। এ টাকায় আমাদের দু ভাইয়ের এক্তার নেই। এ টাকা তোমার। তুমি রাখো।

সকালে এমন আদর···

এবং···

সন্ধ্যায় বজ্র-বিদ্যুতের তেমনি হুঙ্কার ! এক-গাড়ী ধান আসিয়া কখন উঠানে পড়িয়াছে, দেবী দেখে নাই···কেহ তাকে বলেও নাই। কাজ সারিয়া সন্ধ্যার দিকে সে উমাপদর পরিত্যক্ত বিছানায় উমাপদর মাথার বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া ছিল···হুঁশ ছিল না···শ্রীপদ আসিয়া ধানের অবস্থা দেখিয়া চটিয়া আগুন ! ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল,—শহুরে মেয়ে ! নিজেকে নিয়েই আছো বৌমা, এই যে ধান-গুলো···নাঃ,···এ-সংসার আর বেশী দিন নয় !

দাঁড়াইয়া দেবী নীরবে শুনিল। তারপর গেল নিজের হাতে ধান তুলিতে। শ্রীপদ বলিল—থাক্‌, আমার ঘরে দুটো লোক আছে কাজ করবার। তা তো নয়। বলেছি, তোমাকে আনা হয়েছে সংসারের ভার নেবার জন্য···তা সে-ভার খুব নিয়েচো, বৌমা!

দেবীর মনে দুঃখ হইল, অভিমান হইল। কি সে না করে? তোমাদের এত পয়সা···

মাসিমার ঘরে দেখিয়াছে মাসিমার কি এমন অবস্থা! তবু···

কিন্তু কি করিবে? এ ভৎর্সনা সহিতেই হইবে। স্বামী···এমন স্বামী পাইয়াছে···স্বামীর মুখ চাহিয়া এর চেয়েও বড় দুঃখ সে সহিতে পারে, এ তো মুখের তুচ্ছ ভৎর্সনা!··

বিধাতা বোধ হয় অলক্ষ্যে বসিয়া মনের এ কথা শুনিয়াছিলেন! পাঁচদিন পরে গরুর গাড়ীতে তুলিয়া উমাপদর আহত রক্তাক্ত দেহ লইয়া ক'জন লোক আসিল। বদমায়েসদের লাঠির ঘায়ে চোট! সঙ্গে পয়সা-কড়ি যা ছিল, তারা লুটিয়া লইয়াছে।

দেবী ছিল রান্নাঘরে···সকলের খাওয়া চুকাইয়া আহারে বসিয়াছিল। এ কথা শুনিয়া ভাতের থালা ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল। ধরা-ধরি করিয়া সকলে উমাপদকে আনিয়া ঘরে শোয়াইয়া দিল। ক্ষেতে শ্রীপদর কাছে লোক ছুটিল।

চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল!

সংসার ছাড়িয়া, রান্না-বান্না ছাড়িয়া বুক দিয়া দেবী স্বামীকে ঘিরিয়া বসিল। শ্রীপদ বলিল,—চিকিৎসা চলছে···তার উপর তোমার এ বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে, বৌমা!···আমার ভাই···মায়ের

পেটের ভাই উমা। চিকিৎসা করবে ডাক্তারে, আর তুমি দেখবে সংসার।

এ-কথা দেবী আজ কাণে তুলিল না।

বহু কষ্টে উমাপদর প্রাণ বাঁচিল। কিন্তু শরীরে শক্তি নাই··· যেন একটু ঝড় আসিলেই প্রাণটুকু খশিয়া ঝরিয়া পড়িবে!

স্বামীর পানে চাহিয়া-চাহিয়া দেবী ভাবে, কি করা যায়? কি করিলে আবার···

উমাপদ বলে,—বাহিরে কোথাও যেতে ইচ্ছা করে। আর কোথাও না হয়, তোমার মাসিমার ওখানে···কালো মামার বাড়ী। এখানে আমার ভালো লাগচে না।

দেবী কহিল,—বলবো বড়-ঠাকুরকে?

—না, না···এ সংসারে কোনো কালে তা হয় নি!

অর্থাৎ এখানে সংসারটাই বড়। যাদের লইয়া সংসার, তাদের বড় করিয়া ধরিবার কল্পনা এ-সংসারে কোনো কালে কাহারো মনে জাগে নাই!

দেবী ভাবে, বড়-ঠাকুরকে এ কথা না বলিলে কি করিয়া চলিবে? চলে না। স্বামীর মনে গভীর হতাশা···প্রাণ বাঁচিয়াছে বটে, কিন্তু সে-প্রাণটুকুকে ধরিয়া রাখিতে এখন কত কি যে করিতে হইবে!

শ্রীপদ বলিল—তোমার বাড়াবাড়ি একটু কম করো বৌমা···উমা সেরেছে। ও কাজ-কর্ম্ম দেখুক। তাতেই ক্রমে বল পাবে। সংসার

ফেলে অষ্টপ্রহর ওকে নিয়ে থাকলে ও-ও সারবে না, সংসারও যাবে।

দেবী ভাবে, যার সংসার, যার জন্য সংসার, যাকে লইয়া সংসার, সে আগে সারিয়া উঠুক!

শ্রীপদ বার-বার সতর্ক করে···

একদিন দেবী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, বলিল—আগে আমার স্বামী, তারপরে সংসার। ওঁকে এ ভাবে ফেলে আমি সংস্যার দেখতে পারবো না।

এ-কথায় শ্রীপদ প্রথমে হতভম্ব হইল, তারপর রূঢ় স্বরে কহিল—তোমার স্বামী! কদিন তুমি এ-স্বামী পেয়েছো, বৌমা?···আর ও আমার ভাই···মায়ের পেটের ভাই। উমাপদ উঠুক···ঘরে পড়ে থাকলে ওর শরীর সারবে না।···

এ কথায় দেবীর কোনো কথা বলিতে প্রবৃত্তি হইল না! সে চুপ করিয়া রহিল। শ্রীপদ ডাকিল,—উমা···

উমাপদ উঠিল।

শ্রীপদ কহিল,—শুয়ে শুয়ে শরীরটা অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ছে। উঠে কাজ-কর্ম্মে মন দে।

উমাপদ কহিল,—হ্যাঁ।

সে কেমন বিরস থাকে! দেবী বলে,—কথা কও না গা···একটু গল্প করো।

উমাপদ বলে,—ভালো লাগে না, দেবী!

—আমি তো তোমার কাছে-কাছে থাকি সংসার ছেড়ে, যেমন তুমি চাও! আমাকেও তোমার ভালো লাগে না?

উমাপদ একটা নিশ্বাস ফেলিল···বলিল,—তুমি আর কাছে-কাছে থেকো না। আমাকে কাজ-কর্ম্ম করতে দাও। তাহলে হয়তো সেরে উঠবো। দাদা বলছে···

দেবী কহিল,—এই যে একটু-আধটু বেরুচ্ছো, কি ভয়ে ভয়ে আমি থাকি!···কোথাও গিয়ে ক'দিন যদি একটু হাওয়া বদলাতে পারতে···

উচ্ছ্বসিত আবেগে উমাপদ বলিল,—পারো দাদাকে বলে কোথাও আমাকে নিয়ে যেতে···কিছুদিনের জন্য অন্ততঃ?

কবিরাজ মশায় মাঝে মাঝে আসেন,—এ সংসারের প্রথা-মত; দু'চারিটা বড়িও উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেন। চোট সারিয়াছে, ব্যাণ্ডেজ নাই, কাজেই ডাক্তার বাবুর বিদায়।

উমাপদ কাজে বাহির হইতেছে। শ্রীপদ নিত্য হুঁশ করাইয়া দেয়, বলে,—বৌয়ের মুখ চেয়ে থাকলে কাজকর্ম্ম বিষয়-সম্পত্তি রসাতলে যাবে। বৌ বৌ···বিষয়-সম্পত্তি বৌয়ের চেয়ে বড়।

কথা শুনিয়া দেবী শিহরিয়া ওঠে। উমাপদর হাত ধরিয়া সে বলে,—আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করো, খাটাখাটি হাঁটাহাঁটি নিজে বেশী করবে না···নিজে চুপ করে বসে থেকে লোক-জনদের খাটাবে? নাহলে আমি মাথা-মুড় খুঁড়ে মরবো।

এ স্নেহে মন গলিয়া যায়! উমাপদ বলে,—তাই হবে, দেবী, সত্যি বলচি।

সেদিন দুপুরবেলা কি যে হইল, দাঁড়াইয়া পুকুর কাটাইতেছিল, জ্যৈষ্ঠের শেষ···মাথাটা কেমন ঘুরিয়া গেল, চোখের সামনে যেন ঢেউ তুলিয়া প্রমত্ত সাগর ছুটিয়া আসিল···সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার আলো গেল নিবিয়া···উমাপদ পড়িয়া গেল।

আধ ঘণ্টা পরে জ্ঞান হইলে কোন মতে উঠিয়া ধীরে ধীরে বাড়ী আসিল। তার মূর্ত্তি দেখিয়া দেবীর প্রাণ উড়িয়া গেল।

খিড়কীর দিকে ছিদাম-জন বন কাটিতেছিল। তার হাতে একটা টাকা দিয়া দেবী তাকে ডাক্তার বাবুর কাছে পাঠাইল। বলিয়া দিল,—তাঁকে এখনি সঙ্গে করে নিয়ে আসবে ছিদাম।

ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন,—এ রকম রোগীকে এখনি ছেড়ে দেছ কাজ করতে,—আশ্চর্য্য! এখন চাই পূরোপূরি বিশ্রাম দুটি মাস···হাওয়া বদলাতে পারলে খুব ভালো। না হলে এই শরীর আর মন নিয়ে একটা বিশ্রী উপসর্গ ঘটতে পারে। তখন হায়-হায় করেও কিছু করা যাবে না।

সন্ধ্যার সময় শ্রীপদ গৃহে ফিরিলে দেবী তাকে সব কথা খুলিয়া বলিল। শ্রীপদ গম্ভীর হইয়া শুনিল। শুনিয়া আরো গম্ভীর স্বরে বলিল,—তাহলে সত্যি···যা শুনলুম? কর্ত্তামি করে তুমিই ডাক্তার ডাকিয়েচো! সকলে বলচে, শহুরে মেয়ে ভাসুরকে এমন অগ্রাহ্য করে!···তা নয়। মানে, এ-বংশে কোনো বৌ নিজেকে এ-রকম সকলের উপরে তুলে ধরেনি। এরা বলচে, এতদিনকার হাঁড়ি বুঝি এবার আলাদা হয়!

দেবী বলিল,—আপনি যদি ওঁকে কোথাও না যেতে দেন, আমি ওঁকে নিয়ে যাবো।

—তুমি !

—হ্যাঁ। আমি।…আমার স্বামী।…ওঁর ভালোয়-মন্দয় আমার যা হবে, এমন আর কারো নয়। আপনার নয়, আপনার সংসারেরও নয়।

শ্রীপদ বিস্ময়ে অবাক্ ! এ সব কি কথা ! এমন কথা কোনো স্ত্রীলোক আজ পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিয়াছে ? বিশেষতঃ পূজনীয় বড়-ঠাকুরের মুখের উপর ? শ্রীপদ কহিল—কার সঙ্গে তুমি কথা বলচো, জানো, বৌমা ?

—জানি, জানি, আমি জানি ! বলিতে বলিতে কান্নায় ফাটিয়া সে একেবারে শ্রীপদর পায়ে লুটাইয়া পড়িল।

শ্রীপদ বলিল—আমার ভাইয়ের মঙ্গল আমার চেয়ে তুমি বেশী বোঝো, বটে !…কতটুকু তুমি ওর জানো ! আমি দাদা…আমি ওকে হতে দেখেছি ! ওকে কোথায় পাঠাবো ? বিষয়-সম্পত্তি ফেলে আমাদের কোথাও যাবার জো নেই। এ-বংশে কেউ তা যায় নি কখনো।

না, না, না ! বুঝিবেন না। বুঝিবেন না ! খালি সংসার আর সংসার ! কিন্তু কাহাকে লইয়া সংসার !

গভীর রাত্রে উমাপদ ডাকিল,—দেবী…

মাথার শিয়রে বসিয়া দেবী পাখার বাতাস করিতেছিল, কহিল—ঘুম হচ্ছে না ?

—না।

নিশ্বাস ফেলিয়া উমাপদ কহিল,—দাদার মত হলো ?

—না।

উমাপদ কহিল—জানতুম। কিন্তু আমি পারছি না, সত্যি।···

দেবী কোন কথা বলিল না, উমাপদর কপালে হাত বুলাইতে লাগিল।

উমাপদ কহিল—আমাদের সংসারে সারা বলো, মরা বলো, বাড়ীতেই সব হয়েছে চিরদিন। পশ্চিমে যাওয়া···আমাদের বংশে কেউ তা যায় নি। এ সব ফেলে যাওয়া সম্ভবও নয়। যাওয়া বড়মানুষী। ভাগ্য কেউ বদলাতে পারে না!

উমাপদ নিশ্বাস ফেলিল। দেবী নির্ব্বাক্।

উমাপদ আবার বলিল,—মনে হচ্ছে, যেন জেলখানায় বাস করচি। কিছু ভালো লাগে না। নিত্য এই এক আকাশ, এক বাতাস, ঐ এক গাছপালা, পথ-ঘাট···কোথাও যদি যেতে পারতুম! তুমি কাছে থাকবে ···তাহলে মনে হয়, শীগগির সেরে উঠতে পারি।

দেবী কহিল—ভেবো না গো···আমি তোমাকে নিয়ে যাবোই হাওয়া বদলাতে···যেমন করে পারি।

—পারবে?

—নিশ্চয়। তোমার প্রাণের জন্য আমি সব করতে পারি।

পরের দিন দেবী উদ্যোগ করিয়া ফেলিল।

বেলা প্রায় দশটা। উমাপদকে খাওয়াইয়া ছিদামকে দিয়া গরুর গাড়ী ডাকাইল। গাড়ীতে দুটো প্যাটরা ও বিছানাপত্র এবং সেই সঙ্গে উমাপদকে তুলিয়া দিল। শ্রীপদকে সংবাদ দিয়াছিল···শ্রীপদ আসিল। পাড়ার লোকজন ইতিমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে··· সেই সঙ্গে বাড়ীর পোষ্য-পরিজন।

ব্যাপার দেখিয়া শ্রীপদ হতভম্ব। দেবী তার পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া বলিল,—ওঁকে নিয়ে এখন মাসিমার ওখানে যাচ্ছি। তার পর ভেবে চিন্তে পশ্চিমে কোথাও যাবো। ওঁকে সারাতে হবে তো!

দেবীর সহজ ভাব, শান্ত স্বর···শ্রীপদর মুখে কথা ফুটিল না।

দেবী কহিল,—আমার গহনা যা আছে, আর সেই পঞ্চাশ টাকা —তাতেই এখন চলবে। তার পরে টাকা পাঠাবেন···দরকার-মতো, যা চাইবো। বিসয়ে ওঁরও তো অর্দ্ধেক অংশ আছে। ওঁর জন্য ওঁর অংশের বিসয় যদি বেচতে হয়, বেচবেন। উনি আমার সব বিষয়-সম্পত্তির উপরে। এখানে রাখলে ওঁকে বাঁচানো যাবে না··· চিঠি লিখলে টাকা পাঠাবেন। ওঁর অংশের টাকা···আপনার টাকা আমি চাইছি না।

কথাগুলো গায়ে বাজিল তীক্ষ্ণ তীরের মতো! রাগে অপমানে শ্রীপদর অঙ্গ জ্বলিল।

শ্রীপদ বলিল—তুমি বলতে চাও, আমার চেয়ে উমার উপর তোমার দরদ বেশী!···আমার ভাইয়ের মঙ্গল আমি দেখি না, তার বিষয়ের উপরে আমার লোভ আছে?

দেবী শ্রীপদর পায়ের উপরে পড়িল, বলিল,—না, না, না·· এমন ইতর নীচ মন আমার নয়। এ পাপ-কথা আমার মনের কোণে কোনদিন ঠাঁই পায় নি, ঠাঁই পাবে না। আমি শুধু ওঁকে বাঁচাতে চাই, ওঁর মুখে আমি হাসি দেখতে চাই। ওঁকে আমি ফিরিয়ে আনবো··· এখন শুধু এখানে রাখবো না। এখানে থাকলে উনি সারতে পারবেন না। আপনি রাগ করবেন না, আশীর্ব্বাদ করুন, পায়ের ধুলো দিন···ওঁকে যেন সুস্থ দেহ-মনে আপনার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারি!

শ্রীপদকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া দেবী গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

শ্রীপদ ডাকিল,—উমা…

উমাপদ কহিল,—সেরে আমি আবার ফিরে আসবো, দাদা। ভয় নেই।

গাড়ী চলিয়া গেল। পাড়ার লোকে এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া যেন অভিনয় দেখিতেছিল!

গাড়ী চলিয়া গেলে সকলের মুখে কথা ফুটিল।

গণেশ সাহা বলিল—একেই বলে শহুরে মেয়ে…পেটে পেটে বুদ্ধি! এমন করে স্বামীকে নিয়ে আলাদা হলো!

কেশবের বৌদি বলিল—তখন বলেছিলুম, নাও আমার ছোট বোন্ পুঁটিটাকে…হোক কালো…এমন ফন্দীবাজী জানে না!

ক্ষমা গিন্নী বলিল—কলি-কাল!

কথা কহিল না শুধু শ্রীপদ। গুম্ হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। চেতনা নাই…নিমেষে যেন সে পাথরের মূর্ত্তি বনিয়া গেছে!

শাশ্বতী

সমরের সঙ্গে স্কুলে এক ক্লাশে পড়িয়াছি। স্কুল ছাড়িয়া কলেজেও দেড় বৎসর। তারপর তার বাপ মারা গেলেন—সমর কলিকাতা ছাড়িয়া দেশে চলিয়া গেল। আর দেখা-সাক্ষাৎ নাই।

দেখা-সাক্ষাৎ না থাকিলেও তার কথা মনে জাগিয়া ছিল বরাবর। একটু অস্বস্তি জাগিত, কেন সে চিঠিপত্র লেখে না? কোথায় আছে? কি করিতেছে?

বি-এ পাশ করিলাম। গেজেট বাহির হইবার পর সহসা একদিন সমরের চিঠি পাইলাম। একখানি পোষ্টকার্ড। সমর লিখিয়াছে—

গেজেটে নাম দেখিলাম। পাশ হইয়াছ। খুব খুশী হইয়াছি। আমার দিন কোনো-মতে কাটিয়া যাইতেছে। এত বড় হতভাগা পৃথিবীতে আর নাই।

একদিন আসিতে পারো না? বেশী দূর নয়,—তেলিনীপাড়া। শেয়ালদায় ট্রেণে চাপিয়া কাঁকনাড়া ষ্টেশনে নামিবে; পরে গঙ্গার ধারে আসিয়া নৌকা লইয়া পার হইবে। আগে যদি চিঠি লিখিয়া জানাও কোন্ ট্রেণে আসিবে, নদীর ঘাটে প্রতীক্ষায় থাকিব। একবার আসিয়ো, ভাই। আমার যাইবার উপায় নাই। উপায় থাকিলে যাইতাম—নিশ্চয়।

আশা করি, ভালো আছ।

পুরানো স্মৃতির দীপ্তিতে বুকখানা আলো হইয়া উঠিল। সমরকে তখনই চিঠি লিখিলাম। লিখিলাম, যাইতেছি।

এবং পরের দিন বেলা দু'টার ট্রেণে যাত্রা করিলাম।

নদীর বুকে নৌকায় বসিয়া ওপারের দিকে চাহিয়াছিলাম, আকাশে

মেঘের ঘনঘটা···পৃথিবীর বুকে স্নিগ্ধতার আবেশ! দিনটা কেমন স্বপ্নাতুর—আমারি মনের মতো!

তীরের কাছে নৌকা আসিলে দেখি, জীর্ণ ঘাট। ঘাটের সিঁড়িতে বসিয়া সমর। তাকে চিনিতে কষ্ট হইল না। সমরের পাশে বসিয়া একটি কিশোরী।

ঘাটে নামিতে কি সে অভ্যর্থনা! মনে হইল, এমন অমলিন সখ্য—এর চেয়ে বড় সম্পদ জীবনে আর কি আছে!

সমর বলিল—একে তুমি চেনো না। বীণা···

পরিচয় বুঝিলাম না। তবে মেয়েটিকে দেখিলে মমতা হয়। মুখে শহরের সে শিখা-দীপ্ত ভাব নাই! সর্ব্বাঙ্গে সৌখীনতার ছাপ বা অহঙ্কারের বাষ্পও নাই! বাঙলার পুরানো স্মৃতির অপরূপ স্নিগ্ধতা মেয়েটির মুখে-চোখে সর্ব্ব অবয়বে শুচি-লাবণ্যের রেখায় জল-জল করিতেছে! সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি!

বীণা আমাকে প্রণাম করিল। আমি কুতূহলী দৃষ্টিতে সমরের পানে চাহিয়া রহিলাম।

মাঠের উপর দিয়া পথ। আইলের বাঁধে-বাঁধে বৃষ্টির জল জমিয়া আছে। দূরে কয়েকটা ইটের পাঁজা···বাষ্প-ধূমের মলিনতায় আচ্ছন্ন!

মাঠের পথ ছাড়াইয়া গঙ্গাযাত্রীর ঘাটের পাশ দিয়া বড় বড় বট-অশথ-আম-কাঁঠালের ছায়ায় ঘেরা গ্রামের পথ ধরিয়া সমরদের গৃহে আসিয়া পৌছিলাম।

জীর্ণ গৃহ··· ক্রমেই ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। তাকে সে-পথ হইতে রক্ষা করিবে, গৃহস্থের সে-শক্তি নাই!

দ্বার-পথে প্রবেশ করিয়া মহানন্দে সমর হাঁকিল—মা···

মা আসিলেন। বাঙলার অতীত গরিমা-মহিমার স্মৃতির মতো মলিন মূর্ত্তি! প্রণাম করিলাম।

পিশিমা আসিলেন। মা, পিশিমা এবং এই বীণাকে লইয়া সমরের সংসার।

পিশিমা ডাকিলেন—বীণা...

বীণা কাছে আসিল। পিশিমা কহিলেন—চায়ের জল চড়িয়ে দাও মা। কলকাতার ছেলে·· চা না হলে ওদের চলে না।

অপ্রতিভ ভাবে কহিলাম—এ বেলায় আমি চা খাই না পিশিমা।

—সত্যি খাও না?

—না।

মা বলিলেন,—তুমি ময়দা মাখো ঠাকুরঝি···উনুনে আমি আগুন দি। খান-কতক লুচি ভেজে ফেলি—আর ছেঁচকি, ভাজা···

মা বীণার পানে চাহিলেন। বীণা কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। মা কহিলেন—কুটনোটা কুটে ফ্যালো মা।

বীণা চলিয়া গেল। দক্ষিণ বাতাসে পল্লবে যে গতি-লীলা জাগে, তার গতিতেও তেমনি ছন্দ-লীলা!

পিশিমা কহিলেন—তুমি বসে কথা কও, বৌ, আমি জোগাড় করচি।

চকিতে গৃহে চাঞ্চল্য জাগিল। আমি কহিলাম—লুচি-তরকারীর দরকার কি মা! মুড়ি নেই? তেল-নুন মেখে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে—খুব ভালো হবে সে!

মা কহিলেন—না বাবা, তা কি হয়!

মা নিশ্বাস ফেলিলেন। পিশিমা চলিয়া গেলেন।

সমর বসিয়া ছিল। আমি সমরের পানে চাহিলাম। কহিলাম,—কি করচো ? লেখাপড়া ছেড়ে দিলে ?

মলিন-হাসি মুখে সমর কহিল—লেখাপড়া চললো না।...চেষ্টা করেছিলুম !

আমি কহিলাম—সংসার তো বড় নয়, সমর।

মা কহিলেন—বাড়ীটুকু নিজেদের। এতেই বাস করতে পারিনে বাবা ! এ-নিয়ে মামলা-মকর্দ্দমা করতে হয়েছিল। কম কষ্ট গেছে ! ভাগ্যে তাঁর বন্ধু পুলিনবাবু ছিলেন, তাই মাথা গোঁজবার জায়গা মিলেছে !

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মার পানে চাহিয়া রহিলাম।

মা কহিলেন—তালপাতার ছাউনি হলেও সেখানে চাকরি নিয়ে উনি পড়েছিলেন—বরাবর। এখানে ছিলেন জ্ঞাতিরা। তাদের উপর দেখা-শোনার ভার ছিল। কখনো তো আসেন নি। কাজেই তারা আমাদের ফিরতে দেখে ক্ষেপে উঠলো যেন ! কারো কাছে বিচার-বিবেচনা পাই নি, বাবা ! শুধু ঐ পুলিনবাবু...মহৎ লোক ! তা আমাদের বরাতে তিনিও রইলেন না !

মা নিশ্বাস ফেলিলেন। নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—এই যে মেয়েটি...বীণা...পুলিনবাবুর মেয়ে। মা নেই। বাপ ছিলেন দুই—মা আর বাপ। তিনি চলে গেলেন ! মেয়েকে দেখে, এমন কেউ নেই। আমরাই আশ্রয়।...বিয়ে হয়নি। হবে কি দিয়ে ? সম্বল নেই ! আমার এই দশা। তার উপর বীণা...ভগবান তামাসা করেই ব্যবস্থা করচেন !

অনেক কথা হইল। সমর এ তল্লাটে কাহারো দ্বারে ঘুরিতে বাকী রাখে নাই। চটের কল, পাটের কল...মাসে পঁচিশটা করিয়া

টাকাও যদি আসে! তা ভগবান না দিলে মানুষ কি করিবে, বলো!

আমি কহিলাম—আমাকে কোনো চিঠি দাওনি কেন সমর?

সমর কহিল—দারিদ্র্যের লজ্জায় কোনো দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারিনি ভাই!

মনে বেদনা বোধ করিলাম। কহিলাম—আমার যে-পরিচয় তুমি জানো, তাতে দারিদ্র্যকে ঘৃণা করবো, এমন ধারণা কি করে তোমার মনে জাগলো?

সমর একটা নিশ্বাস ফেলিল, কহিল—সে ধারণা জাগে নি। তবে মন এমনিতেই পঙ্গু-কাতর হয়ে গেছে! পাশের খপর হঠাৎ চোখে পড়লো। তোমার নাম দেখে চিঠি না লিখে থাকতে পারলুম না।···

চাকরির কথা উঠিল। পাশ-করা দিগ্‌গজের দল যে-ক্ষেত্রে চাকরির সন্ধানে ফ্যা-ফ্যা করিয়া বেড়াইতেছে, সেক্ষেত্রে সমর কি চাকরির বা আশা রাখে! বিশ-পঁচিশ টাকার কেরাণীগিরিতে অভাব আরো বাড়িয়া যাইবে! কোথাও সন্ধান লইতে সমর বাকী রাখে নাই! দু'পয়সা রোজগার হইবে ভাবিয়া এই পাড়াগাঁয়ে বাগান জমা লইয়াছে, পুকুর জমা লইয়াছে···কিন্তু কোনো দিকেই কোনো সুবিধা করিতে পারে নাই।

সমর কহিল—ছিটকে আমি একবার বেরিয়ে পড়তে চাই, সেই আসাম কিম্বা আফ্রিকার জঙ্গলে···

পিশিমা কহিলেন—শোনো বাবা, ছেলের কথা! তুমি ছাড়া আমাদের দেখবার আর কে আছে! তোমাকে ঘিরেই আমাদের এখানে পড়ে থাকা! সেই-তোমাকে কোথায় কোন্ বনবাসে পাঠিয়ে আমরা কি নিয়ে এখানে থাকবো? আমি তো বলি,

আসামে যেতে হয় যদি তো আমাদেরো নিয়ে চলো! ছেলে তা শুনবে না!

সমর কহিল—তোমাদের কোথায় নিয়ে যাবো! তোমাদের ছেড়ে থাকতে পারলে কতকটা তবু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুরতে পারবো!

পিশিমা কহিলেন—মাকে কে দেখবে? ঐ তো মানুষ!

আমি কহিলাম—বসে থেকেও কিন্তু কোনো ফল হবে না তো!... দূর-দূরান্তেই চেষ্টা করা উচিত!

দু' চোখ কপালে তুলিয়া পিশিমা কহিলেন—এখানে আমাদের ফেলে?...তার উপর এই বীণা! আমি এ-কথাও বলছি, বীণার সঙ্গে বিয়ে দি...

সমর কহিল—কি যে তুমি বলো পিশিমা! নিজে কি খাবো, কি পরবো, ঠিক নেই! তার উপর বীণা...

বীণার পানে সমর একবার চাহিল, চকিতের জন্য। আমিও চাহিলাম। বীণা যেন কাঠ! মুখ তার লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়াছে! পিশিমা কহিলেন,—ও তো সিংহাসন চাইছে না, বাবা! ওকে কোথায় কার হাতে দেবে? দিতে গেলে যে-ব্যবস্থার দরকার, তারো অভাব!

চারিদিককার কথায়-বার্ত্তায় দুঃখ-বেদনার আর্ত্ত সুর! আমার প্রাণটা নিরুপায়তার আবর্ত্তে দোল খাইতে লাগিল!

রাত্রিটা সমরের ওখানেই রহিয়া গেলাম।

সকালে বেড়াইতে বাহির হইলাম, সঙ্গে সমর আর বীণা। নদীর ধারে আঘাটায় গিয়া বসিলাম। নদীর বুকে মাছের নৌকা, তরী-তরকারীর নৌকা।...

সমর কহিল—তোমরা বসো। আমি আসছি।

আমি কহিলাম—কোথায় যাবে?

বীণা সমরের পানে চাহিয়া রহিল। বীণার পানে চাহিয়া সমর কহিল—পচুর ওখানে যাচ্ছি মাছের জন্য।

আমি কহিলাম—খরচপত্র করবার দরকার নেই, সমর। আমি মাছের কাঙাল নই। তোমার এখানে যে-স্নেহ পেয়েচি, তাতে ও-সব কোনো আয়োজনের দরকার নেই।

হাসিয়া সমর কহিল—পচুকে দাম দিতে হবে না। সে রেয়ৎ। কালে-ভদ্রে খাজনা দেয়। তার মাছে আমাদের অধিকার আছে।

সমর নিষেধ শুনিল না··· চলিয়া গেল। একটা মাটীর ঢিপির উপরে বসিয়া রহিলাম আমি আর বীণা। বীণার দৃষ্টি উদাস।

ডাকিলাম—বীণা···

বীণা একটা নিশ্বাস চাপিয়া আমার পানে চাহিল। আমি কহিলাম,—পিশিমা যে-কথা বলেচেন, তোমার তাতে কি মত?

কথাটা বীণা বুঝিল না···কুতূহলী দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিল।

আমি কহিলাম—সমরের সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা···

বীণা কোনো জবাব দিল না; মাথা নামাইল। সে লজ্জায় কি অপরূপ মাধুরী ফুটিল!

আমি কহিলাম—সমর বিদেশে যাবে বলচে,—কি বলো তুমি?

বীণা উদাস দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিল, কহিল,—আমি জানি না!

আমি কহিলাম—তোমাদের মন কেমন করবে না?

জলের প্রসারের পানে চাহিয়া চাহিয়া বীণা একটা নিশ্বাস ফেলিল,

ফেলিয়া কহিল—আমার ভয় করে।...এখানে আমরা চারজনে এমন-ভাবে মিলে-মিশে আছি...যে একজন যদি কোথাও চলে যায়, মনে হবে, একটা অঙ্গ যেন খশে গেছে!

বীণা চুপ করিল। আমি তার পানে চাহিয়া রহিলাম। একটু আলাপে বুঝিলাম, স্কুল-কলেজে লেখাপড়া না করিলেও বীণার মনের গভীরতা সহজ নয়। স্কুল-কলেজে-পড়া মেয়েরা যে-ভাবের বুলি শিখিয়া যেখানে-সেখানে সেই বুলি আওড়াইয়া বেড়ায়—তাদের কথার সঙ্গে অন্তরের বড় একটা যোগ থাকে না...বীণা তাদের দলের নয়! তার মনের অতল-গহনে যেন বিশ্ব-নিখিলের ছায়া!

বীণা কহিল—আমারো ইচ্ছা হয়, পিশিমা যা বলেন...দূরে যদি যেতে হয় তো সকলে একসঙ্গে যাবো। এই ছোট্ট গণ্ডীটুকুর মধ্যে মন যেন হাঁপিয়ে ওঠে!

রৌদ্র-মাখা আকাশে ছোট ছোট মেঘের টুকরা ভাসিয়া চলিয়াছে... আশা-হাসি-ভরা মনে বেদনার কালো স্মৃতির মতো!

আমি কহিলাম—আমার মনে হয়, এই ছোট গণ্ডী ছেড়ে বেরিয়ে পড়াই কর্ত্তব্য! রবিবাবু বলেছেন, 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন—চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন!'

অসংলগ্ন এমনি অনেক কথার আলোচনা হইল। কথাগুলার মধ্য হইতে এটুকু বুঝিলাম, বীণার মন এই পরিবারটির আশায়-আনন্দে-বেদনায় পরিপূর্ণ। নিজের কথা সে ভাবে না।...সমরকে বিবাহ? সে আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন! সে স্বপ্ন দেখিতে বীণার বুক কাঁপিয়া ওঠে!

নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলাম, দিকে দিকে ভগবান কত দুঃখই পুঞ্জিত রাখিয়াছেন!

বৈকালের দিকে কলিকাতায় ফিরিলাম। ফিরিবার মুখে পিশিমা বলিলেন—বিদেশে যাবার কথায় তুমি আপত্তি করো বাবা। মা বারণ করে না। সংসারে থেকেও মার মন সংসারে নেই। মা বলে, যাতে ভালো হবে, তাই করবে, আমার পানে তাকাবার দরকার নেই! দাদা গিয়ে অবধি বৌ যেন সন্ন্যাস নিয়েছে!···তুমি বারণ করো সমরকে···তোমাকে মানে।

আমি কহিলাম—কিন্তু পিশিমা···

পিশিমা কহিলেন—আমার মনে হয়, বিদেশে গেলে ওকে আর ফিরে পাবো না!

পিশিমার দু' চোখ সজল, কণ্ঠ বাষ্পার্দ্র হইয়া উঠিল।

আমি বলিলাম—আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমি বারণ করবো।

সপ্তাহ-শেষে মন আকুল হইল···সমরের সেই গৃহকোণের জন্য অস্থির হইয়া পড়িলাম।

আসিয়া দেখি, জীর্ণ গৃহে নিরানন্দের মাত্রা বাড়িয়াছে। বীণা নদীর ঘাটে পড়িয়া পায়ের হাড় ভাঙ্গিয়াছে। হাসপাতালে পায়ের পরিচর্য্যা হইলেও ডাক্তার স্পষ্ট বলিয়াছেন—ও-পা এ-জন্মে সারিবে না। সারা জীবন খোঁড়া হইয়া থাকিবে। সমর আমাকে কথাটা জানাইল। আরো বলিল—বীণাকে আমি বিয়ে করবো। তারপর বলিল,—চাকরি পেয়েচি···ছাপরায়···পঞ্চাশ টাকা মাহিনা। যাবো।

বীণার সঙ্গে দেখা করিলাম। বীণা বিছানায় শুইয়া ছিল।

আমাকে একান্তে পাইয়া সজল-চোখে বীণা কহিল,—আপনি বারণ করুন।

আমি কহিলাম—কিসের বারণ বীণা?

বীণা কহিল—বিয়ে করবে বলচে…

আমি কহিলাম,—ভালো কথাই তো।

বীণার দুই চোখের কোণে জলের বড় বড় ফোঁটা। বীণা কহিল—না!

আমি তার পানে চাহিয়া রহিলাম। বুঝিলাম, এই সরলা পল্লী-বালিকা সমরকে কতখানি ভালোবাসে…

বীণা কহিল—লোকে বিয়ে করে সুখের জন্য, আরামের জন্য! এই জন্ম-খোঁড়াকে নিয়ে চিরজীবন দুঃখ ভোগ করবে, আমি তা হতে দেবো না!

শ্রদ্ধায় আমার মন ভরিয়া উঠিল।

আমি কহিলাম—তোমার পা কি কখনো সারবে না?

বীণা হাসিল। ম্লান হাসি। বীণা কহিল,—না, সারবে না। আমি জানি।

আমি কহিলাম—ডাক্তার বলচেন…

বীণা কহিল—আমাকে লুকোবার জন্য মিথ্যা কথা বলচেন। আমি বুঝি।…

সন্ধ্যার পর এই সব আলোচনা চলিতেছিল। মা, পিশিমা, সমর…সকলের সাধ, বিবাহ হোক্। বীণার ধনুর্ভঙ্গ-পণ, না! বীণা বলিল—অমন কাজ করলে আমি মরবো!

সমরের চাকরির কথায় মত দেওয়া ছাড়া উপায় নাই! শ্রাবণ মাসেই তাকে গিয়া 'জয়েন' করিতে হইবে।

আমি কহিলাম—এ চাকরি ছেড়ো না। আমি এঁদের দেখবো। চাকরি পাকা হোক, দু'এক মাস ওখানে থাকো…তারপর বাসা করে সকলকে নিয়ে যেয়ো।

সমর কহিল,—বীণাকে আমি বিবাহ করবো। তুমি বুঝিয়ে মত করাও!

আমি কহিলাম—মত যাতে হয়, সে চেষ্টা আমি করবো।

সমরের গৃহে প্রতি সপ্তাহে গিয়া উদয় হইতাম। সমর ছাপরায় গিয়াছে। চিঠি লিখিয়াছে—ঘোরাঘুরির কাজ; সেজন্য আরও বিশ টাকা বেশী পাইবে। তবে কবে কোথায় থাকিবে, তার কোন ঠিকানা নাই! কাঠের কারবার···নেপাল-সীমান্ত হইতে সারা চাম্পারণ বিভাগটা তাকে চষিয়া বেড়াইতে হয়।

চিঠিপত্র ক্রমে কমিয়া আসিল। মাসে মণি-অর্ডার আসে একবার করিয়া·· তাহাতে অনিয়ম ঘটে নাই!

পূজার সময় বীণা কহিল—চিঠি লেখেন না কেন, বলতে পারেন?

আমি কহিলাম—সত্যি, টাকা পাঠাচ্ছে, অথচ এক ছত্র চিঠি···

দুই চোখের দৃষ্টিতে রাশীকৃত বেদনা ভরিয়া পিশিমা কহিলেন—কিছু তো বুঝচি না, বাবা!

মা শুধু নির্ব্বিকার···চোখে শূন্য উদাস দৃষ্টি! মুখে কথা নাই!

আমি কহিলাম—সামনে ছুটী···আমি ছাপরায় যাবো'খন।

গেলাম ছাপরায়। গিয়া খবর পাইলাম, সমর গিয়াছে নেপালে—এক-জায়গায় থাকে না।

তবু নিরস্ত হইলাম না। ঠিকানা লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে তাকে ধরিলাম···তরাইয়ের প্রান্তে!

সমর খুশী হইল। আমি কহিলাম—চিঠি লেখো না কেন? তাঁরা ভেবে অস্থির হন।

সমর কহিল—একবার খুব অসুখ হয়···চিঠি লেখা তখন থেকেই বন্ধ। ভয় হলো, যদি মারা যাই! নিত্য খপর দিলে—সে-খপর বন্ধ হলেই মার আর পিশিমার ভাবনার অন্ত থাকবে না! তার চেয়ে চিঠি না লেখাই ভালো। টাকা ঠিক যাচ্ছে। তা থেকে বুঝবেন, বেঁচে আছি, ভালো আছি। তুমি গিয়ে বলো, বড্ড কাজ·· চিঠি লেখবার অবসর পাই না।···

তেলিনীপাড়ায় মায়ের কাছে মস্ত চিঠি লিখিলাম—সমর ভালো আছে—কাজ খুব বেশী। আরো ক' মাস ঘোরাঘুরির পর স্থির হইয়া এক জায়গায় বসিবার আশা আছে, তখন সকলকে এখানে আনিবে।

সমরকে ধরিয়াও দু'চার ছত্র লিখাইয়া লইলাম। চিঠি ডাকে দিয়া আরাম বোধ করিলাম।

দু'চারদিন পরের কথা।

গভীর রাত্রি। ঘর-বাড়ী কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল। বিছানা হইতে উঠিয়া ডাকিলাম—সমর···

সারা দিনের কাজের শ্রান্তি। সমর আরামে ঘুমাইতেছিল। ধাক্কা দিলাম। ঘুম ভাঙ্গিয়া সে উঠিয়া বসিল। আমি কহিলাম—ভয়ঙ্কর ঝড় উঠেচে···বাড়ী-ঘর দুলচে।

সমর কহিল—ঝড় নয়, ভূমিকম্প! এখানে প্রায় হয়।

উপায়? আমি যেন দিশাহারা হইলাম।

সমর কহিল—পালাই, চলো···

ছুটিয়া বাহিরে আসিলাম।

ছোট একটা পাহাড়ের গায়ে ছিল সমরের আস্তানা। ছুটিয়া নামিতেছিলাম, সহসা সামনে অন্ধকারের ঢেউ। পাহাড়ের মত প্রকাণ্ড ঢেউ! মাথায় আঘাত বোধ করিলাম।···চক্ষু মুদিয়া আসিল।

যখন চোখ চাহিলাম, চারিদিকে দিনের আলো ফুটিয়াছে!

সমর?

নাম ধরিয়া ডাকিলাম···

কেহ সাড়া দিল না। পায়ে চোট লাগিয়াছিল···কোনোমতে হামা দিয়া অগ্রসর হইলাম। উপড়ানো বড় গাছের মস্ত গুঁড়ির নীচে···

চীৎকার করিয়া উঠিলাম—সমর!

গাছ চাপা পড়িয়া সমর প্রাণ দিয়াছে!

তিন-চার মাস পরে গৃহে ফিরিলাম। দেশে-দেশে ঘুরিয়াছি! সমরের গৃহে সমরের নামে মণি-অর্ডার পাঠাইয়াছি। সমর তো চিঠি লেখে না! এত বড় সর্ব্বনাশের খপর তাঁরা কি করিয়া জানিবেন? জানিলে একসঙ্গে ক'টা প্রাণী···ভাবিতে শিহরিয়া উঠিলাম!

একদিন তেলিনীপাড়ায় আসিলাম।

পিশিমা কহিলেন—অনেকদিন আসো নি, বাবা।

আমি কহিলাম—এখানে ছিলুম না।

পিশিমা কহিলেন—সমরের খপর জানো?

বুকখানা ধ্বক করিয়া উঠিল। কহিলাম—কেন বলুন তো?

পিশিমা কহিলেন—আমার কেমন ভালো মনে হয় না!

আমি তাঁর পানে চাহিয়া রহিলাম। মনের মধ্যে কে যেন মুহুর্মুহু কামান দাগিতেছিল!

পিশিমা কহিলেন—ছ'মাস হলো স্বপ্ন দেখি, যেন মস্ত একটা গাছের নীচে চাপা পড়ে সে কাতরাচ্ছে! শুধু একদিন নয়, বাবা··· উপরি-উপরি তিনদিন ঐ স্বপ্ন দেখেচি! কাঁটা হয়ে আছি! কাকেও এ-কথা বলি নি!···তুমিও কোনো চিঠি-পত্র পাও নি?

কহিলাম—না।

পিশিমা কহিলেন—মাসে-মাসে টাকা আসছে। তবু আমার এ আতঙ্ক ঘুচলো না···

আমি শিহরিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

মা···তেমনি নির্ব্বিকার নিশ্চিন্ত ভাব! পৃথিবীতে তাঁর সবচেয়ে বড় সর্ব্বনাশ ঘটিয়া গিয়াছে, সে-সংবাদ তাঁকে কোন দিক দিয়া যেন স্পর্শ করে নাই!

পিশিমা আমাকে চুপি-চুপি কহিলেন—বৌদির কাছে এ কথা তুলো না···! ছেলের নাম ও মুখেও আনে না। পাথর হয়ে গেছে!

বীণা তেমনি ঘরের কোণে মাদুরে পড়িয়া আছে।

আমি গিয়া ডাকিলাম—বীণা···

বীণা জবাব দিল না। সন্ধ্যার অন্ধকার জীর্ণ ঘরের কোণে কোণে ঝাপটাইয়া আঁটিয়া বসিতেছিল।

আমি ডাকিলাম,—বীণা···

বীণা কহিল,—বিপদের কথা শুনেচেন? আপনার বন্ধু···কার্ত্তিক মাসে সেখানে ভূমিকম্প হয়···সেই ভূমিকম্পে···

বীণার কথা শেষ হইল না। আমার বুকে সে-রাত্রের সেই ভূমিকম্পের প্রচণ্ড দোলন···

আমি কহিলাম—পাগল হয়েচো!

বীণা কহিল—একখানা চিঠি আসে। ওঁর মনিব লিখেছিল। বাঙলায়। সে-চিঠি যেদিন আসে, মা আর পিশিমা সেদিন গিয়েছিল—তারকেশ্বরে। আমি সে চিঠি পাই। তাতে লেখা ছিল—ভূমিকম্পে গাছ-চাপা পড়ে সমরবাবু মারা গেছেন।···

আমার সামনে হইতে পৃথিবী যেন কোথায় সরিয়া গেল!

একটা প্রকাণ্ড নিশ্বাস ফেলিয়া বীণা কহিল—সে চিঠির কথা কাকেও বলি নি। ওঁরা জানেন না। জানলে পাগল হবেন! আপনিও যেন এ-কথা ওঁদের বলবেন না! সে চিঠি আমি এই আঁচলের খুঁটে বেঁধে রেখেছি···ক'মাস ধরে···

বীণার দু' চোখে জলের ধারা···

নিশ্বাস ফেলিয়া আমি বীণার হাত আমার হাতে চাপিয়া ধরিলাম। কোন কথা বলিতে পারিলাম না। বলিবার কথা নাই!

স্মৃতি-কণা

চারিদিকে বার্ষিকী আর জয়ন্তীর ধূম!

অফিসের বড়বাবু মকরন্দ মিত্রের ষাট-বৎসর বয়সের বার্ষিকী উৎসব সারিয়া যখন পথে বাহির হইলাম, তখন আটটা বাজিয়া গিয়াছে। ট্রামে উঠিলাম আমি আর সুশীল। এক পাড়ায় দুজনের বাড়ী।

সুশীল বলিল,—যতই তোয়াজ করো রে ভাই, কাজের সময় কাজী—কাজ ফুরোলে পাজী! এই এক বার্ষিকী-হাঙ্গামায় মাথা-পিছু চাঁদায় খরচ হলো চার টাকা করে!···এর কোনো সুফল মিলবে, তুমি ভাবো?

আমি তখন চুপ করিয়া ভাবিতেছিলাম, বাড়ীতেও বছরের এমনি সময়ে কি যেন একটা বার্ষিক উৎসবের ব্যাপার ঘটে! বিবাহের বার্ষিকী নয় তো?

দু'বার তারিখ ভুল করিয়াছিলাম। তার ফলে গৃহিণী দু'দিন বাক্য বন্ধ করিয়াছিলেন! এবং সেই সঙ্গে···

দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না। আজো সেই ভুল করিলাম না তো? অথচ রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে···সদ্য চার টাকা চাঁদা দিয়াছি বড়বাবুর এই বার্ষিকী বৃষোৎসর্গে! নিজের বিবাহের বার্ষিকীর জন্য আবার এখন···

ফুলের মালা চাই, সেণ্ট, সাবান, ভালো শাড়ী, পিন্···ব্যয় বড় অল্প নয়!

মনের কারখানায় অনেক কিছু ভাঙ্গাগড়া করিতেছিলাম। সুশীলের

কথার জবাব দিলাম না। সুশীল আপন-মনে বড়বাবুর জুলুম ও বেইমানির সহস্র কাহিনী বকিয়া চলিয়াছে…

জগুবাবুর বাজারের সামনে ট্রাম থামিল। নামিয়া পড়িলাম এবং ভয়াতুর মন লইয়া একবার দাঁড়াইলাম এক ফুলের দোকানের সামনে। এক জোড়া গোড়ে মালার দাম জিজ্ঞাসা করিলাম। দাম বলিল,—দেড় টাকা।

শিহরিয়া সরিয়া আসিলাম। ভাবিলাম, বলি, গাছের তোলা ফুল…একটা রাত্রির ওয়াস্তা! কাল সকালে মলিন হইয়া ঝরিয়া যাইবে! এ রাত্রে তোমার মালা কে কিনিবে বাপু? কার বিবাহের বার্ষিকী আজ যে তুমি আশা রাখিয়াছ, প্রেয়সীর মন রাখিতে চড়া দামে সে আসিবে এ মালা কিনিতে? তার চেয়ে যা পাও, ছাড়িয়া দাও!

কিছু না বলিয়াই গৃহে ফিরিলাম। স্তব্ধ গৃহ। জমাট হিমানীর চাপে গৃহের প্রাণ যেন জমিয়া আছে! স্ত্রী লইয়া যারা ঘর করেন, অর্থাৎ যাদের স্ত্রীগণ গৃহিণী-পদে প্রোমোশন পাইয়াছেন, তাঁরা অফিসের পর গৃহে পদার্পণ করিবামাত্র গৃহের আব-হাওয়া দেখিলে বুঝিতে পারেন, রাত্রিটা শান্তিতে কাটিবে, না, ত্রুটি-অপরাধের লক্ষ কৈফিয়তের তীরে প্রাণ জর্জ্জরিত হইবে! বাঙালীর ঘরে যে-সব অভাগা কর্ত্তৃপদবাচ্য, তাদের অপরাধের তো সীমা নাই! অন্ততঃ আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা…

দোতলার ঘরে আসিলাম। গৃহিণী চিঠি লিখিতেছিলেন। আমার পানে চাহিলেন।

ষ্টেশনে যাত্রী নামিলে, তার পানে আবগারী দারোগারা যে-দৃষ্টিতে চায়, এ দৃষ্টি ঠিক তেমনি! সন্দেহাতুর দৃষ্টি! বোধ হয়,

দেখিতেছিলেন, অফিস-ফেরত কোনো-কিছু কিনিয়া আনিলাম কি না! সারা দিনটা স্ত্রীজাতি আশায় আশায় থাকে, অফিস-ফেরত স্বামী-জাতি কিছু-না-কিছু কিনিয়া ঘরে ফিরিবে! আমার হাতে প্যাকেট বা পার্শেল কিছুই ছিল না। স্ত্রীর মুখে মেঘের ছায়া নামিল। আমি তাহা স্পষ্ট লক্ষ্য করিলাম। মন অপ্রসন্ন হইল।

যথাসাধ্য বিনীত বিগলিত স্বরে আমি কহিলাম,—কোনো খপর আছে না কি···এঁ্যা?

নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি কহিলেন,—না। খপর আবার কি! তবে তোমার যে তা মনে থাকবে না, এ আমি জানতুম।

মনে থাকিবে না! চট্ করিয়া মনের অলিগলিতে দৃষ্টি বুলাইয়া লইলাম। বুঝিলাম, নিশ্চয় সেই বিবাহ-বার্ষিকীর কথা! কহিলাম, —মনে নেই বললেই হলো! হুঁঃ! খুব মনে আছে।

গৃহিণীর জন্ম-তিথি···আজ? না! সে তিথি দিন মাস বৎসর···কিছুই মনে নাই! তবে শ্রাবণ মাসে তাঁর জন্মদিন নয়! কারণ গত জন্ম-দিনে তাঁকে খুশী করিয়াছি এ-কালের একটি ফার্‌কোট কিনিয়া দিয়া!

সাহসে ভর করিয়া বলিয়া ফেলিলাম—বিয়ের এ্যানিভার্শারি-নাইট! আমি ভুলি নি গো। সে-রাত্রি ভোলবার নয়!

গায়ের জামা খুলিলাম। গৃহিণী জামা লইয়া হ্যাঙ্গারে রাখিলেন —মনটায় খুশীর আমেজ! খুশী-মনে বলিলেন—আমার ভাগ্যি। আমি ভেবেছিলুম, যে তোমার ভোলা মন, সে-রাত্রির কথা ভুলে গেছ।

মনে দ্বিধা জন্মিল। হেঁয়ালির ভঙ্গীতে কহিলাম,—এসেছে?

—কি এসেছে?

কহিলাম—জীবনের সে পরম-ক্ষণ! সে-ক্ষণটিকে কি শুধু হাতে

স্মরণ করবো, ভাবো? সে-রাত্রিকে স্মরণ করে তোমাকে যদি মনের মতো উপহার না দি, তা হলে আমার বেদনার সীমা থাকবে না যে!

কথাটা নিজের কাণেই শুনাইল যেন নিতান্ত পোষাকী-রকম! একেবারে সাহিত্যের ভাষা! এ যুগের কোনো মাসিকের পাতা হইতে সদ্য যেন কথাগুলো চুরি করিয়াছি!

গৃহিণী তাড়াতাড়ি পাখার সুইচ্ টিপিয়া দিলেন, বলিলেন,—বসো। একটু জিরোও···

বসিলাম।

গৃহিণী কহিলেন—কিছু এনেচো না কি?···সত্যি?

কহিলাম—পাওনি? বাড়ীর নাম-ঠিকানা আমি লিখে দিয়ে এসেছি···সন্ধ্যার মধ্যে পাঠাবে। সে কাজ পাকা করে তবে আবার অফিসে গিয়েছি। আজ আবার অফিসে ছিল হাঙ্গাম··ঐ বড বাবুর শ্রাদ্ধ-বাসর!

অত কথা গৃহিণীর কাণে গেল না। তিনি কহিলেন—তা হলে তারা ঠিকানা ভুল করে বসলো না কি?

তাঁর স্বরে বিলক্ষণ উদ্বেগ ও বিস্ময়!

কহিলাম—ভুল অমনি হলেই হলো! আজ না আসে, কাল সকালে গিয়ে আমি গলা টিপে ধরবো না?···কিন্তু এখনো এলো না ···সত্যি, আমার ভারী বিশ্রী লাগছে!

কথার সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

গৃহিণী কহিলেন,—মন খারাপ করো না। তুমি যে ভোলোনি, এতেই আমি খুশী। কেন না ইদানীং তুমি একটু-আধটু অমন ভুল করো। তার মানে, এত খাটুনি···কখনো তো দেহের যত্ন করলে না! এত করে বলি, একটু পেস্তা-বাদাম এনে দাও, খাওয়াই। আমি

মেয়ে-মানুষ, আমি তো নিজে বাজারে কিনতে যেতে পারি না।··· চাকরদের দিয়ে কি আনানো যায় না? যায়। চাকরে যে-জিনিষ আনবে, তা দুর্গন্ধ, পচা! মুখে দিতে পারবে না! তাই তোমাকে বলা।

কথার শেষে গৃহিণী মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। মনের মধ্যে যা হইতেছিল···

গৃহিণী কহিলেন,—সাজগোজ করতে হয়, করি, তোমারই জন্য··· তুমি ভালবাসো···তাই। না হলে সত্যি ভাবি, আমাদের পিছনে এত টাকা খরচ করচো···নিজের দিকে একবার তাকাও না!

মলিন ম্লান দৃষ্টিতে গৃহিণী আমার পানে চাহিলেন। সে-দৃষ্টিতে স্নেহ-মমতা উথলিত! এমন ব্যাপার বহুদিন দেখি নাই।

কি করিয়া দেখিব? বাড়ীতে তাঁকে যথাসম্ভব এড়াইয়া চলি। দেখা দিলে দোষের লক্ষ কৈফিয়ৎ দিতে হয়!

আজিকার সন্ধ্যা জমিয়াছে ভালো!

কোনো কথা কহিলাম না।

গৃহিণী কহিলেন—আচ্ছা, বিয়ের সময়কার কথা তোমার মনে আছে?

কহিলাম,—নেই? কি বলো তুমি! জীবনের পরম এবং চরম মুহূর্ত্ত! ঐ মুহূর্ত্তটির সম্ভাবনায় যৌবনের প্রথম নিমেষগুলো পুষ্পময় হয়ে থাকতো! ঐ মুহূর্ত্তের পর থেকেই তো জীবনে জাগলো নূতন বসন্ত! চির-বসন্ত!···

গৃহিণী কহিলেন—আমার মনে আছে, সারা বাড়ী জুড়ে আলোর মালা···লোকজনের চেঁচামেচি···তার মধ্যে বেজে উঠলো শাঁখ! বুকটার মধ্যে যা করে উঠলো···ওঃ···তারপর শুভদৃষ্টি! তোমাকে কি সুন্দর যে দেখেছিলুম!

কহিলাম—কিন্তু তখন আমি সুন্দর ছিলুম, সত্যি! নয়? আঠারো বছর আগে···মাথায় তখন টাক পড়েনি! চেহারাও···

গৃহিণী কহিলেন—তারপর বৌ সেজে গাঁট-ছড়া-বাঁধা এলুম এ-বাড়ীতে···তারপর ফুলশয্যা···তোমার আদর···বাপের বাড়ী যাওয়া ···তুমি লুকিয়ে-লুকিয়ে সেখানে যেতে! ভাবি, সে সব দিন কত শীগগির ফুরিয়ে যায়!

গৃহিণীর স্বর আবেগে বিজড়িত! আমার মনে হইতেছিল, যেন একটা রোমান্সের ছবি চোখের সামনে রঙে-রঙে ফুটিয়া বহিয়া চলিয়াছে!

আমি কহিলাম,—তোমার মনে আছে কি না, জানি না। আমার কিন্তু মনে আছে··সেই একদিন তোমাদের বাড়ী রাত্রে···গম্ভীর হয়ে ছিলুম! তুমি বললে, কি ভাবচো গা? আমি বললুম, তোমার দুর্ভাগ্যের কথা! আমি তোমার কত-বড় শত্রু, সেই কথা! তুমি বললে—ছি, ও-কথা বলতে নেই। তখন তোমাকে বললুম,—আমার খুব জ্বর হয়েছিল। ডাক্তারে দেখে সন্দেহ করেন, তার পর নানা পরীক্ষায় তাঁরা বলেচেন, আমার যক্ষ্মা রোগ হয়েছে! এ কথায় তুমি কি কান্না কেঁদেছিলে···শেষে তোমাকে কত করে বোঝাই! তুমি বললে—তাতে কি! আমার কিচ্ছু ভাবনা হবে না! তোমার এঁটো খেয়ে, চিবুনো পাণ খেয়ে আমিও যক্ষ্মা করবো···মনে পড়ে?

গৃহিণী কহিলেন—পড়ে না? খুব মনে পড়ে!···তোমারো সে-সব মনে আছে, দেখছি!

সহর্ষে কহিলাম—থাকবে না? হুঁ, বলো কি!

গৃহিণী ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন—তাই বটে! এ সব মনে আছে বেশ—শুধু মনে থাকে না—এত করে যে বলি,—কিছু ন্যাপথিলিন এনে দিয়ো! গরম জামা-কাপড়গুলোকে না হলে

পোকার হাত থেকে বাঁচাতে পারা যাবে না! বলি, বিনুর একটিও জামা নেই, দর্জ্জি রোজ এসে-এসে ফিরে যাচ্ছে···খানিকটা টুইল কি কেম্‌ব্রিক-কাপড় এনে দিয়ো! বলি, চাকরদের বিছানা নেই, বেচারারা ছেঁড়া মাছুরে আর মেঝেয় পড়ে থাকে রাত্রে···এ সবের কোনোটা মনে থাকে না তো! অথচ এ-সব না হলে সংসার চলে না!···তা যাক্ গে, মরুক্ গে, তুমি দেনে-অলা—যখন মর্জ্জি হবে, আনবে।···কিন্তু পয়সা দিয়ে কেনা নয়, লাইব্রেরীর বই দুখানা ফেরত দিয়ে তার বদলে আর দুখানা নতুন বই আনবে—সেজন্য সকালে বই দুখানা নিজে নিয়ে কাছে রাখলে, অফিস যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে গেলে···তা সে বই···?

আকাশ হইতে পড়িলাম! ওঃ! বই দু'খানা? ঠিক! বই দুখানা··· অফিস যাইবার সময়···হাঁ, ট্রামে বসিবার জায়গা মেলে নাই, দাঁড়াইয়া আছি, জীবন সেই ট্রামে ছিল, বই দুখানা হাতে লইল দেখিবার জন্য! তার পর···

না, সে বই ফেরত লইতে ভুলিয়া গিয়াছি! কাল সে বই আদায় করিতে হইবে! সে কথা গৃহিণীকে আর বলিলাম না। বলিলাম,—অফিসে একটু হাঙ্গামা ছিল···নিজে যেতে পারিনি তাই।

গৃহিণী কহিলেন,—তবে যে বললে কি-জিনিষ আনতে বেরিয়েছিলে ··

ঢোঁক গিলিয়া কহিলাম,—ও!···সে অন্য জিনিষ। তা বই দুখানা দিয়ে বেয়ারাকে লাইব্রেরীতে পাঠিয়েছিলুম। দশখানা নতুন বইয়ের নাম দিয়েছিলুম সেই সঙ্গে। হুঁঃ, ব্যাটা বই নিয়ে আজ আর অফিসে ফেরেনি। কাল তোমার বই পাবে নিশ্চয়।

গৃহিণী কহিলেন,—দেখি, কবে পাই। যে তোমার ভোলা মন··· তাই আমার দুঃখ হয়।

উঠিলাম।...নিত্যকার সুর জাগিয়াছে...এখনি আলাপ ঘনায়িত হইয়া আগুন ছুটিবে!

গৃহিণী কহিলেন—উঠ্‌লে যে!

কহিলাম—মুখ-হাত ধুয়ে আসি।

গৃহিণী কহিলেন—তেতো লাগচে, বুঝেচি! তা যাক, ঐ যে বিয়ের এ্যানিভার্শিরি ভেবে কি কিনেচো, সেটার কাল তাগিদ দিয়ো। বরাতে যদি কিছু মেলে!...কখনো তো সখ্ করে কিছু কিনে দিলে না! বিয়ের এ্যানিভার্শারির এখনো পাঁচ মাস দেরী। এটা শ্রাবণ মাস। বিয়ে হয়েছিল অঘ্রাণ মাসের শেষে। তা সে এ্যানিভার্শারি দেরীতে হলেও মনে করে যদি কিছু উপহার কিনে থাকো, তাহলে কালই সেটা এনে দিয়ো। তোমার জিনিষ তোমারি থাকবে। পরি। দেখে তোমার সুখ, তোমার তৃপ্তি! অর্ডার দিয়ে শেষে আবার তা কাটিয়ে দিয়ো না যেন! যে তোমার ভুলো মন...হয়তো কাল তাগাদা দিতেই ভুলে যাবে। তাহলে অনর্থপাত হবে, মনে রেখো। আর মামুলি শাড়ী কি ব্রুচ্ যেন এনো না! যা আমার নেই, এমন জিনিষ এনো। বুঝলে, খরচ সেই করো, জানি। একটু বুঝে যদি সে-খরচ করো...সব দিকে ভালো হয়, তাই আমার বলা! সাংসারিক বুদ্ধি তো হলো না কোনো দিন! সাধে বলি! যাকে সইতে হয়, সে-ই জানে কি জ্বালা!

গৃহিণী বকিতে লাগিলেন। আমি সরিয়া পড়িলাম।

ভুলিয়াছিলাম লাইব্রেরীর বই বদল করিতে...সে ভুলের খেশারৎ দিতে কাল আবার ছুটিতে হইবে কোনো সুরাটী দোকানে...বলিয়াছি উপহার কেনা মজুত...সে কথা উল্টাইতে পারি না! উল্টাইলে সংসারে যা ঘটিতে পারে, ভাবিলে রোমাঞ্চ হয়!

স্বপ্ন-ভঙ্গ

ট্রেণে চড়িয়া হতাশ চক্রবর্ত্তী আসানশোল চলিয়াছে। কোলের উপরে একরাশ বাঙলা সাপ্তাহিক কাগজ…আইভরি-ফিনিশ মলাটে বিলাতী ফিল্ম-ষ্টারদের মন-ভুলানো ছবি! একখানা কাগজ হাতে লইয়া তাহারি পাতায় ছাপা "সাহিত্যের পথে" কলম্‌টা সে পড়িতেছিল একান্ত নিবিষ্ট মনে। এ-কলমে সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে কত রকমের মজার মজার খপর ছাপা হয়! হতাশ সেই সব সংবাদ পড়িতেছে।

—'কাঁচা' সম্পাদক শ্রীএককড়ি দত্ত সেদিন বাদার দিকে কাঁকুড় ধরিতে গিয়া এক-কোঁচড় গল্পের প্লট সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়াছেন।

—'আগুন' কাব্য-প্রণেতা শ্রীহলধর খেন মহাশয়ের জন্মতিথি-উৎসবে বাঙলার পাব্‌লোভা কুমারী চিঙ্কিংড়া সান্যাল সেদিন পাখ্‌না নাচ নাচিয়া সকলকে নিদ্রাতুর করিয়া দিয়াছিলেন।

—'তড়িৎ' সম্পাদক শ্রীভেকেন্দ্র রায় মহাশয়ের নূতন বই 'ভাঙ্গা খড়খড়ি' বাজারে বাহির হইয়াছে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

খপরগুলি তার বুকে বিঁধিতেছিল মাছের কাঁটার মতো।

অর্থাৎ হতাশ চক্রবর্ত্তী নিজে একজন ঔপন্যাসিক। কিন্তু বাঙালী জাত এমন পাজী যে তারা রাজ্যের লোকের লেখা বাজে উপন্যাস-গল্প কিনিবে, তবু হতাশের উপন্যাসের সন্ধানও লইবে না কখনো! একখানা নয়, পাঁচ-পাঁচখানা উপন্যাস সে ছাপিয়া বাহির করিয়াছে! সমালোচনার জন্য সে-সব বই অনেক কাগজওয়ালাকে পাঠাইয়াছে, তারা দু'লাইন সমালোচনা লিখিয়া ছাপাইতে পারিল না! 'প্রাপ্তি স্বীকার' কলামে দু'একটা কাগজ শুধু বইগুলার নাম ও দাম মাত্র

উল্লেখ করিয়া কর্ত্তব্য সারিয়াছে। অথচ মাসের পর মাস ধরিয়া নিজেদের দলের ঐ হারু আর নরুর···বইগুলার কি স্তুতিবাদই না ছাপিতেছে দু'চার কলাম ধরিয়া! সকলে যেন ষড়যন্ত্র করিয়াছে! পাজী! শয়তান! হতাশের নাম কেহ মুখে আনে না! কাহারো কাছে সে যদি বলে, আমি উপন্যাস লিখিয়াছি (এ-কথা সে সকলকে ডাকিয়া শুনায়) তো অবাক হইয়া সে প্রশ্ন করে,—সত্যি?

হতাশ বলে—সত্যি।

শ্রোতা বলে—নিজের নামে লেখো না, নিশ্চয়?

হতাশ বলে—নিশ্চয় নিজের নামে লিখি।

শ্রোতা বলে—কৈ, হতাশ চক্রবর্ত্তীর লেখা কোনো গল্প-উপন্যাস পড়িনি তো! হতাশ চক্রবর্ত্তী বলে লেখক আছে, তাও জানি না!

রাগে হতাশ বলিয়া ওঠে! বটে! তা জানিবে কেন? তোমরা পড়িবে যত ঐ···

হতভাগা বাঙলা দেশ! আর তার চেয়েও হতভাগা সে···তাই এই বাঙলা দেশে লেখক হইয়া জন্মিয়াছে!

ট্রেণের কামরায় 'সাহিত্যের পথে' নানা পথিকের কথা পড়িতে পড়িতে বুক একেবারে নিশ্বাসের বাষ্পে ভরিয়া উঠিল! সকলের সব কথা ছাপিতে পারো, আর সে যে চলিয়াছে এই আসানশোল···

তা না ছাপো, শুধু ছোট একটি কথা! যে হতাশ চক্রবর্ত্তী একালের একজন অগ্রগতি লেখক···মস্ত মনস্তত্ত্ববিদ্···সেক্স-সাইকলোজির তরুণ আচার্য্য···এ-কথাটুকু স্বীকার করিতে তোমাদের কলমে কালি ঝরে না?···

নিশ্বাস ফেলিয়া কাগজ রাখিয়া সে চাহিল খোলা জানলা দিয়া বাহিরের পানে।

ট্রেণ চলিয়াছে। বাহিরে ঐ ক্ষেত, জলা, পুকুর। দূরে ধূসর আকাশ! সহসা মনে হইল, সে একা, নিঃসঙ্গ! এবং তাহার বিরুদ্ধে চারিদিকে দুরাত্মাদের ক্রূর অভিসন্ধি চলিয়াছে!

আবার একটা নিশ্বাস পড়িল। তারপর সে চাহিল কামরার অপর প্রান্তে। চাহিয়া যা দেখিল, অপূর্ব্ব!

কামরার অপর প্রান্তে এক তরুণী! তার হাতে একখানি বই। তরুণীর দুটি কালো আঁখি-তারা দুনিয়া ভুলিয়া বইয়ের ছত্রে ছত্রে বিচরণ করিতেছে···সেই মধুলোভী মধুকর যেমন ফুলের পাপড়িতে পাপড়িতে ঘোরে!

চমৎকার!

আরো চমৎকার লাগিল যখন একটু পরে সে-বই মুড়িয়া বেঞ্চে রাখিয়া তরুণী সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া ওদিক্‌কার খোলা জানলায় ঝুঁকিয়া বাহিরের পানে তাকাইল! অর্থাৎ সেই পরম-ক্ষণে হতাশ চক্রবর্ত্তী দেখিল, তরুণী যে-বইখানি পড়িতেছে, সেখানি তাহারি লেখা সদ্য-প্রকাশিত নভেল "বুক-ভাঙ্গা"! তরুণী নিবিষ্ট মনে তাহার লেখা পড়িতেছে? বাঃ!

এ দৃশ্য হতাশ শুধু কল্পনা করিয়া আসিতেছে···চিরদিন! বাঙলার গৃহে গৃহে খোলা জানলার ধারে বসিয়া এলায়িত-কেশা রূপসী তরুণীরা ···তাদের সামনে খোলা হতাশ চক্রবর্ত্তীর টাট্‌কা প্রাণের ফট্‌কাখোলা উপন্যাস! কলেজের বাসে কিশোরী ছাত্রীদের হাতে হাতে তাহারি লেখা বই। লেকে, পার্কে, সিনেমায়, থিয়েটারে তরুণীদের মুখে শুধু কথা চলিয়াছে,—পড়েচেন হতাশ চক্রবর্ত্তীর নতুন নভেল "আলতা-পা"?

কি সাইকলোজি ! ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে মাঠে বসিয়া তরুণী পড়িতেছে তার লেখা নভেল "ভাঙা পাঁচিল" ! সঙ্গিনী আসিয়া বলিল—ও ! পড়িস নি এ্যাদ্দিন এ-বই ? সত্যি, কি লেখা ! পড়তে পড়তে হাত একেবারে নিশ্‌পিশ্‌ করতে থাকে !

কেন তা হয় না ? নভেল তো তোমরা পড়ো, ওগো বাঙলার তরুণী পাঠিকার দল, সেই যদি পড়ো, তবে হতাশের লেখা নভেল পড়িতে কেন তোমাদের আগ্রহ জাগে না ?

এ কথা ভাবিয়া ভাবিয়া মন তার মুচড়িয়া দুমড়িয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে বসিয়াছে !

সে-কল্পনা আজ সত্য হইয়া চোখের সামনে জাগিয়া দেখা দিয়াছে ! তার নভেলের এমন রূপসী তরুণী পাঠিকা !

হতাশের মনে হইল, ট্রেণের কামরায় এ তরুণী···ও যেন সারা বাঙলা দেশ ! ও যেন বাঙলা দেশের বুক ফুঁড়িয়া কামরায় আসিয়া উদয় হইয়াছে বাঙলার সমস্ত পাঠিকার প্রতিনিধির মূর্ত্তি ধারণ্যা !

নিমেষে নিজেকে মনে-মনে তরুণীর চরণে সে বিকাইয়া দিল।

ওদিকে তরুণীর চোখে পড়িল বুঝি একরাশ কয়লার গুঁড়া ! সবেগে মুখ ফিরাইয়া তরুণী আবার বেঞ্চে বসিল। বসিয়া রুমালে চোখ মুছিল।

হতাশের মনখানা বেদনায় হায়-হায় করিয়া উঠিল। ও-চোখে পড়িতে কয়লার গুঁড়ার এতটুকু মমতা হইল না !

তরুণী আবার বই খুলিল। হতাশের লেখা নভেল, "বুক-ভাঙ্গা"।

ওঃ ! এ উপন্যাসের নায়িকা উল্কাবতীকে কি আশ্চর্য্য মূর্ত্তিতেই না সে বাহির করিয়াছে !

আলাপ করা যায় না ? শুধু একটি প্রশ্ন ! কেমন লাগিতেছে ?

কি করিয়া সে প্রশ্ন তোলে? কি বলিয়া?

বলিবে, আমিই শ্রীহতাশ চক্রবর্ত্তী…যার লেখা নভেল তুমি এমন নিবিষ্ট চিত্তে পড়িতেছ! পড়িয়া তাকে ধন্য করিয়া দিয়াছ!

ট্রেণ চলিয়াছে…চলিয়াছে…ধোঁয়া উড়াইয়া চলিয়াছে! হতাশের মনে এ প্রশ্নও ধোঁয়ার চক্র তুলিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া ঘনায়িত হইল।

পাহাড় ফাটাইয়া নদীর বেগ একদিন বাহির হইয়াছিল। হতাশের বাসনাও তেমনি…

সুযোগ মিলিল। তরুণী বই মুড়িয়া বাহিরের পানে তাকাইল।

হতাশ কহিল,—কার লেখা বই পড়চেন?

তরুণী ফিরিয়া চাহিল। কহিল—জানি না।

তরুণী মলাট দেখিল, দেখিয়া বলিল,—এই যে! লেখকের নাম হতাশ চক্রবর্ত্তী।

হতাশের মন…ওঃ! বুকখানা ফাটিয়া ঠেলিয়া না বাহির হয়!

হতাশ কহিল—ভালো লাগচে?

তরুণী কহিল,—জানি না। একজন লোক বড্ড মিনতি জানিয়ে বললে, দয়া করে একখানা বই কিনুন…কত দিকে কত পয়সা তো খরচ করি! তাই কিনলুম।

বটে!

তরুণী কহিল,—পড়বেন? নিন্ না…

বইয়ের পাতার মধ্য হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া লইয়া তরুণী বইখানা আগাইয়া দিল।

হতাশ দেখিল, তরুণী বই পড়েন নাই! বইয়ের পাতার মধ্যে চিঠি গুঁজিয়া সেই চিঠি পড়িতেছিলেন!

তরুণী হাসিল। হাসিয়া বলিল—যে নাম! বাপ্‌রে! বোধ হয়, রাবিশ! আমি তো একটি লাইন পড়তে পারিনি।··

বইখানা ছুড়িয়া তরুণী দিল হতাশের দিকে! হতাশের মনে হইল বলে, বই না হয় নাই পড়িয়াছিলে! তাই বলিয়া মিথ্যা করিয়া যদি বলিতে, বেশ বই! কি তাহাতে তোমার ক্ষতি হইত? অথচ সে-কথায় হতাশের মনে···

এ-বয়সে ও-মুখে এমন কঠিন ভাষা···পাষাণী···তুমি কোথায় পাইলে!

শেষ